মরামাটি



পূর্ব্বাশা লিমিটেড়

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৮

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৫

দুই টাকা চার আনা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মরানাটি

রেল-লাইনের উঁচু বাঁধটা সাপের মতো আঁকাবাঁকা দেখা যায়—তার গা ঘেঁসেই পাহাড়ের বুনো দেয়াল। অথচ পাহাড় অনেক দূরে—দু'তিন মাইল ত খুব। বাঁধের এদিকে শুধু ক্ষেত—মেটে জলের সায়র—ওদিকে গাঁয়ের জংলা ডাঙ্গায় গিয়ে শেষ।

শশাদলের জংলা ডাঙ্গা ছেড়ে এসেছে ভরত সেই কখন—দুপুর বেলা। বিকেলের রোদ এখন গায়ে ঠাণ্ডামত লাগে। ঘাম হচ্ছে না—জলো বাতাসও আছে, তাই।

ছিদ্দিক তামাকই টানে, না ঝিমোয়, ঠিক বোঝা যায় না। নীল্‌চে পাতলা ধোঁয়া তার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে আসে মাঝে মাঝে—মাঝে মাঝে ধানের ধারালো ডগাগুলো নৌকোর বুকে লেগে সর্‌-সর্‌ আওয়াজ হতে থাকলেই ছিদ্দিকের গলা থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোয়: "কাণা গরুর জুদা পথ। চোখের নজরও খেয়েছিস্‌?"

নৌকোটাকে পথে ফিরিয়ে এনে একটু কেশে নেয় ভরত: "লগিটা বেচাল হয়ে গিয়েছিল—অভ্যেস ত নেই অনেক দিন।"

মনে হয় ছিদ্দিক একটা হাঁচি সাম্‌লে নিলে, আসলে ও হাসে।

সাঁতার শিখলে ভুলে যায় কেউ? লগি ঠেলা ত সাঁতার শেখা-ই রে উজবুক।" কল্কের আগুনটা জলে ছুঁড়ে দিয়ে ছিদ্দিক হুঁকোটা ছই-এর গায়ে বাঁশের হুকে ঝুলিয়ে রাখে।

"ভুলব না কি করব—লগি ঠেলে ত আর নিজেকে ঠেলে নেওয়া যায় না—লগি ঠেলিস্‌ বলে কি এই বুড়ো বয়সেও তোর লাঙ্গল ঠেলা কামাই যাচ্ছে?"

"নইলে শয়তান কাঁধে ভর করবে—তোর যা হয়েছে। শয়তানের কল চালাতে যেন্নি যাচ্ছিস!" ওজু করতে গেল ছিদ্দিক।

ভরত চুপ করে গেল। ছিদ্দিক নমাজে বসবে বলে নয়—পাহাড়টা তার চোখের অনেক কাছে যেন এগিয়ে এল। পাহাড়টা নিয়ে কি আতঙ্কই না আজ ভরত গাঁয়ে দেখে এলো—ছেলেবেলায় পাহাড়ে বাঘ নেমেছে শুনলে যেন্নি তার আতঙ্ক হত।

রাত্তিরে হয়ত কেউ এসে কেমন অদ্ভুত গলায় ডাকৃত: "জয়াদা—ঘুমুচ্ছ?" এই গলার সঙ্গে আশ্চর্য্য পরিচয় ছিল তার ঘুমের—ঘুম ভেঙে জেগে উঠত ভরত। কাঁথার নীচে আরো খানিকটা শীত ঢুকে ঠির-ঠির করে কাঁপিয়ে তুলত তার শরীর। মাচার বগল থেকে লাঠিটা নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেত তার বাবা—জয়ামাল।

বাইরের সেই অদ্ভুত গলা বল্‌তে থাকৃত: "গোয়ালে ঢুকে শালা নিয়ে গেছে ধলী বাছুরটা—"

ভারি গলায় জয়া প্রশ্ন করত: "ছিঁচ্‌কে চোর?"

"হুঁ। চিতে।"

"তা শালা কি আর এদিকে আছে? মশাল দেখে ভেগে পড়েছে কখন!"

"খুঁজে দেখবে না জয়া দা?"

"দেখবি? চল তবে।"

কাণ সজাগ রেখে শুনত ভরত ওদের পায়ের আর কথার শব্দ

অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মার চিন্তা ছিল না একটুও। উঠে গিয়ে ঝাঁপের পাথালি বাঁশটা এঁটে দিয়ে চুপচাপ এসে আবার শুয়ে পড়ত। বাঘের হলুদ গায়ের কালো চক্কোরগুলো বড় হতে হতে তার ঘুমের সঙ্গে ঝাপসা হয়ে মিশে যেত কখন, বাবা যে রাত্তিরেই ফিরে এসেছে তাও আর সে জানত না।

অনেকদিনই বলেছে মা: "সবাই বলে তুমি বাঘের পেটেই যাবে একদিন।"

কজ্বির তাবিজটা নেড়ে নেড়ে বলেছে বাবা: "পেছন থেকে এসে যদি ঘাড় মটকে দেয় ত আলাদা—সাম্‌না-সাম্‌নি জয়মালকে কাবু করে এ তল্লাটে এমন বাঘ নেই।"

মা খুসী হয়েও বলত: "রেতে-বিরেতে যখন-তখন বেরুবার কি কাজটা পড়েছে তোমার?"

ভরত মনে-মনে সাবাসি দিত মাকে—বাবার কাছে ভিড়তে ভয় পায় ভরত--নইলে এ কথা সে নিজেই জিজ্ঞাসা করত। বাবার সাহসে ভরতের হাত-পা সব অসাড় হয়ে আসে।

বুক উঁচু করেই বল্‌তে থাকত বাবা: "আমার উপর ভরসা করে সবাই। এখনত আর গাঁয়ের বাইরে যাইনে—বিয়ের আগে রতনপুর, কুড়াখাল অবধি ডাক পড়ত, যেতাম। জমিদারের আমরা বরকন্দাজ। এখন ত শুধু বাঘ আর ভূত-পেত্নী। বাপঠাকুদ্দারা আমাদের বর্শা-কিরিচ নিয়ে ত লড়াইও করেছে।"

"নাও খুব গিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই কর।" কলসীটা টেনে নিয়ে মা ঘাটের গোবাটি ধরত।

"তা-ও শালারা আসে কই লড়াই করতে? গায়ে মরচে ধরে গেল। জমিদার মহালে গেলে আমি তার মোট আগ্‌লাই—ওই ত কাজ।"

ওইত কাজ—বল্‌লেই হল? ভরত একবার গিয়েছিল জয়ামালের সঙ্গে মহালে। জমিদার ছিলেন—পাইক প্যাদা আরো অনেক। শিবরাম রায়ের ধবধবে সাদা পৈতে আর সাদা গোঁফ—গরদের পাঞ্জাবী, আর গরদের চেয়েও গাঢ় হলুদ গায়ের রং, জমিদার বল্‌তে আজও ভরতের এ চেহারাই মনে হয়। বিশাল উঁচু আর মোটা। পান্‌সী-ঘাট থেকে তুলে নিতে যে পাল্কী এসেছিল তত বড় পাল্কী ভরত আর জীবনে কোনোদিন দেখেনি। বেহারাগুলোও তেমনি জাঁদরেল, শক্ত পুরু মাংসের উপর শিরাগুলো ফুলো-ফুলো—একটা অশ্বত্থগাছের নীচে বসে ওরা জটলা করছিল—গাঁজাই টেনে নিচ্ছিল হয়ত। এদিকে জমিদার পাল্কীতে এসে বসে আছেন। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে জয়া কোমরে জড়িয়ে নিলে, চট করে, দৌড়ে গিয়ে ছুটো বেহারার ঘাড় টিপে ধরল। দূর থেকে ভরত দেখছিল আর শিউরে উঠছিল—জয়ার থাবায় অত মজবুত ঘাড়ও নেতিয়ে পড়েছে, হিড়-হিড় করে ওদের টেনে নিয়ে আস্‌ছে জয়া।

তারপর কাছারি-বাড়িতে জমিদারের পেছনে পেতল-মোড়া বাঁশের লাঠিটার উপর থুতনী গুঁজে এম্নি চোখে চেয়ে থাকত জয়া, প্রজারা ভাবত বিধাতার কোপদৃষ্টিও বুঝি এত বিষম নয়। জমিদারের পায়ের কাছে রূপোর থালায় নজরানা দিয়ে যাবার সময় ওদের পা কাঁপত, জমিদারকে দেখে নয়—জয়ামালের মুখের উপর চোখ পড়তেই।

তহশীলদারের মারফৎ খবরটা রটে গেলেই হল—জয়ামাল আস্‌ছে জমিদারের সঙ্গে। গোমস্তা-পাইকের আঙুলটিও আর নাড়্‌তে হত না—তেমন তেজী সাপের চোখেও যেন ধূলো-পড়া পড়্‌ত—কাছারির উঠোনে এসে জমা হত একের পর এক সব। তেমন বাঁকা পিঠই কারো ছিলনা যা জয়ামালের রদ্দায় সোজা হয়ে যায়নি।

রাত্তিরে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বসে শিবরাম রায়ের গোঁফটা হাসিতে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। তহশীলদার অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন: "জয়া এসেছে ব্যস্ আর একটি পাই-ও পড়ে নেই। বাবুর আর এখন মেহনৎ করে আসবার কি দরকার? জয়া এসে ঘুরে গেলেই আপদ চুকে যায়।"

"তোকেই এ মহালের নায়েব করে দি—কি বলিস জয়া?"

জমিদারের ঠাট্টাটাও যে কত বড় অনুগ্রহ তা জয়ার মুখ দেখ্‌লেই বোঝা যেত! চুপ করে ঘরের একটা অন্ধকার কোণায় বসে থেকে ভরত হাঁপিয়ে উঠছিল—ঘরে অন্ধকারই বেশি, আলো যা আছে কেমন লাল্‌চে মত, খুঁটিতে জড়ানো লাল সালুর জন্যেই হয়ত। জমিদারের সুন্দর মুখটাও তাতে কি রকম বিশ্রী দেখায়! আর বাবাকে মনে হয় অসুরের মত। ভরতের মনের অসুরের চেহারার সঙ্গে এক এক করে জয়ার হাত-পা-গর্দান-বাব্‌রী-গোঁফ সব মিলে যাচ্ছিল। কেবল সিংহীটা নেই, নইলে বুঝি সে তার সাদা দাঁতগুলো দিয়ে ঠোঁটও চেপে ধরত। অসুরের মত বলেই কি বাবা বাঘ খুঁজতে যায়?

অসুর না হলে নবমী পূজোর দিন কেউ করতে পারে ওরকম? মোষ-বলি হয় জমিদার-বাড়ির পূজোয়—অনেকবারই মা ভরতকে ওখানে যেতে দেয়নি। তবু একবার পালিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরের

প্রকাণ্ড ভীড়ে সে ঢুকে পড়েছিল। নাটমন্দিরের তিনদিকে দোতলার বারান্দায় মেয়েদের ভীড়। ঢাকের বাদ্যিতে বুক ঢিপ ঢিপ করে ওঠে--আর মণ্ডপে যেন আগুন লেগেছে এমনি ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াতে গরদের কাপড় পরে শিবরাম রায় জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আঙ্গুল দিয়ে তাঁকেই মেয়েরা দেখাচ্ছিল হয়ত—কিন্তু আঙ্গুল তাদের মণ্ডপের দরজার দিকেই উঁচিয়ে উঠ্‌ছিল—সেখানে তার বাবা—জয়ামাল। পুরুতঠাকুরের কাছ থেকে আশীর্ব্বাদী নিচ্ছে—খড়্গা নিচ্ছে হাত পেতে। মালকোচা দিয়ে কাপড়-পরা জয়ামালের—কোমড়ে ময়নামতি চারখানার লাল গামছা জড়ানো---কপালে রক্তচন্দন।

খড়্গা হাতে যখন এগিয়ে আসছে জয়ামাল ভীড়ের মধ্যে তখন বিরাট হৈ-চৈ। রোজই জয়াকে অষ্টপ্রহর দেখ্‌ছে সবাই—তবু এখন তাকে দেখবার জন্যে লোকের কি ঠেলাঠেলি! ঠেলাঠেলিতে ভরত ভীড় থেকে পেছিয়ে পড়ে। আর দেখতে পায়না কিছু। একবার শুধু লোকের মাথার উপর চকচক করে ওঠে খড়্গাটা—জোকার দিয়ে ওঠে মেয়েরা, ওপর থেকে ওরা দেখ্‌তে পায় বলি হয়ে গেছে। মোষের মাথাটা কাঁধে নিয়ে লাফাতে থাকে জয়া। তার পিঠ বেয়ে রক্তের কি ডগ্‌ডগে ধারা—ভরতের দাঁতকপাটি লেগে যায়।

সিধে নিয়ে বাড়ি ফিরতে জয়ার বেলা গড়িয়ে আসে। বাগ্গা ওম্নি চেঁচিয়ে ওঠে: "নিজে ত অসুরামি করে বেড়াবেই—ছেলেটাও তেম্নি তৈরী হচ্ছে!"

মেয়েরা ওরকম পেছন থেকে খেঁকাতেই থাকে তাতে পুরুষের হুঁস দিলে চলে না। জয়া মুখ টিপে একটু হাসে শুধু।

ঘরের মধ্যে কাণ পেতে থাকে ভরত। মার নালিশটা শুনে বাবা কি বলে শুনবার জন্যে।

"বারহায় বললুম বাস্‌নে—তবু কখন পালিয়ে চলে গেছে বলি দেখতে—"

"ও তাইতেই তুমি অস্থির, আমি ভাবলুম কি জানি বা—" দাওয়ায় উঠে বসল জয়া—"তা বলি দেখে শিখুক—আমার পরে ত ওকেই খাড়া হাতে দাঁড়াতে হবে। এ আমাদের অনেক পুরুষের কাজ।"

বাপ্পার মেজাজ আজ চড়ে যাচ্ছিল: "তুমিও বা কি? বছর বছর পাঁঠা-মোষ কুপিয়ে বেড়াবে, তোমার ছেলেপিলে কেউ বেঁচে থাকবে ভেবেছ?"

"বাবা মোষ কোপাত বলে আমি বেঁচে নই? ও হচ্ছে শত্তুর বলি। জমিদারের বরকন্দাজ ত আমরা, তাঁর শত্তুরদের নিকেশ করে দিচ্ছি।"

"আ-হা, শত্তুরের কি বহর—যত রাজ্যের ভেড়া-পাঁঠা আর মোষ—"

ঘরের মধ্যেই ভরত অস্থির হয়ে ওঠে। তাকেও ওমনি করে মোষ বলি দিতে হবে না কি কোনোদিন? সমস্ত শরীরে তার কাঁপুনি ধরে যায়।

"ভরত কোথায়?" জয়া জিজ্ঞাসা করে।

"ঘরের মধ্যেই আছে।" সিধে তুলে রাখতে বাপ্পা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ডাক যখন পড়বেই তার, অপেক্ষা করে লাভ নেই। ভরত সুরসুর করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

"শোন্ ভরত—" জয়া ভরতের মুখের উপর চোখ রাখলে। সে চোখ জবাফুলের মত লাল। বাবা গাঁজা টানে—অনেকের কাছেই শুনেছে ভরত। গাঁজা টানলে নাকি খুন পর্য্যন্ত করতে পারে লোক। কোনো বাছ-বিচার থাকে না। জড়সড় হয়ে ভরত এগিয়ে গেল।

"বাপকা বেটা হওয়া চাই, বুঝলি?" এবার সত্যি অসুরের মত নীচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল জয়া: "বলি দেখলে বেশ ফূরতি হয় ত তোর?"

ফূরতি? ভরত বলে ভয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাবার কাছে তা বলার উপায় নেই। আস্তে আস্তে বলে: "হুঁ—"

"অমন মিন্-মিন্ করে কথা বলিস কেন রে ভরত—চিম্‌সেপানা আওয়াজ! তোর বয়েসে আমি কিনা করতুম?"

ভরত একটু হাসতে চায় কিন্তু হাসিটা বোঝা যায় না।

"কবি গান শুনতে যাবি? আমার সঙ্গে। তোর মাকে না বলে চুপিচুপি শেষরাতে বেরিয়ে যাব দুজন। নরসিংদীর কাশীকান্ত শীলের দল, তোফা গান গায়।"

কোত্থেকে হঠাৎ বাঙ্গা এসে উড়ে পড়ল: "হয়েছে, আর ওকে কুবুদ্ধি দিতে হবে না। ওম্নি পেটভরা ওর কুবুদ্ধি। তোমার সামনে মেনি মাছ—আর নইলে সিংহ-অবতার। দুগ্‌গাকে মারধোর করে ও কিছু রাখে? ছোট বোন বলে রেয়াত নেই!"

দুগ্‌গাও যে ওকে ছেড়ে দেয় না একথা বলতে গিয়েও ভরত থেমে যায়। মনে হয় অন্যায় অপরাধগুলো বাবার সাম্‌নে তার চোখে-মুখে এম্নি তরতাজা জেগে ওঠে যে কথা বলে কিছুতেই তাদের ঢাকা যায় না।

নমাজ সেরে ছিদ্দিক ছই-এর নিচে হামাগুড়ি দেয়: "এই বেলা আমার হাতে দে লগিটা—তামাক খেয়ে নে একটু ভরত।"

"ষ্টেশন ত প্রায় এসেই গেল। অইটুকু ত আর—তুই বরং গড়িয়ে নে। সোয়ারী পেলে তোর ক'ঘণ্টা লগি ধরতে হয় কে জানে! আমার ত ব্যস্ এই খতম।" ভরতের সারা গায়ে লালচে লোমের ফাঁকে ফাঁকে ঘামের কণা জমে গেছে।

"ধেৎ, ওত আমার অভ্যাস। তোর কেন খামকা এ মেহনৎ করা?"

"তোর নৌকোয় এলুম—এ মেহনৎটুকু করব না?"

ছিদ্দিক এগিয়ে এসে লগিটা নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি সুরু করে দেয়। দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখটার আড়ালে ভরত যেন খুঁজে পায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ছিদ্দিকের সেই সরল মুখটারই আদল। বিলে ত্রিভুজ-জালে মাছ ধরতে গিয়ে মাছ নিয়ে তারা যেমি কাড়াকাড়ি করত, আজ সে কথাটাই মনে পড়ে ভরতের। লগিটা ছেড়ে দিয়ে ছই-এর নিচে এসে বসে ভরত।

ছেলেটা মানুষ হল না—জয়ামাল শিবরাম রায়ের কাছে প্রায়ই নালিশ জানাত। কেমন যেন গিইয়ে থাকে ভরত, তাগদই নেই শরীরে। জমিদার-বাড়ির ধারেই ঘেঁসতে চায়না, বলে, ভয় করে। কোথায় খোকাবাবুর সঙ্গে এখন থেকেই চলা-ফেরা করবি তা নয় ত মাঝিদের পাড়ায় পড়ে থেকে নৌকোর ছই তৈরী করছে—সরু-সরু বাখারি কেটে চ্যাটাই-এর গায়ে মনসার মূর্ত্তি বানাচ্ছে—পূজো হবে কৈবর্ত্তপাড়ায়। তুই কি ঘরামির কাজ করবি না আচায্যি-কুমোরের ব্যবসা ধরবি যে সারাদিন ওই টুকি-টাকি নিয়ে পড়ে আছিস্? মরদের রক্ত নেই তোর গায়ে? জয়া লেঠেলের ছেলে নোস তুই?

শিবরাম রায় তাকিয়াটা কোলে টেনে নিয়ে পা দুটো জয়ার দিকে ছড়িয়ে দেন: "খোকাবাবু কি আর বিষয়-আশয় দেখবে রে জয়া? শহরে থেকে পড়াশুনো করছে।"

জয়া তার রুক্ষ থাবাটা শিবরাম রায়ের শ্লথ, নরম মাংসের উপর আলগোছে বুলোতে থাকে: "বিষয়-আশয় দেখবে না বলেন কি, দেবতা? এমন সোনার বিষয়—মণিমুক্তো ফলে—"

শিবরাম অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে রইলেন। কিন্তু সেদিকে জয়ার লক্ষ্য করবার দরকার নেই। তার চোখের উপর জমিদার আছেন, আছে তাঁর চকমিলান বাড়ি—শ্যাওলা পড়ছে, ফাটলও ধরছে একটু কিন্তু তাতে কি এসে যায়, পুরোনো বাড়িতে ওই এক আধটু জঞ্জাল আছেই। পাইক প্যাদা নায়েব তহশিলদার গোমস্তায় কাছারি গম্‌গম্‌ করে—নতুন করে কিছু ভাববার দরকার কি জয়ামালের?

"এবারও বৃষ্টিতে ফসল মরে গেল জয়া।" শিবরাম ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

"কোথায় দেবতা? আমাদের এদিকে ত ডগডগে সব চারা—"

"রায়পুর তালুকের ফসল মারা গেছে—সদানন্দ চিঠি দিয়েছে এবারও প্রজারা খাজনা মাপ চায়।"

"ওসব ব্যাটাদের কারসাজি, দেবতা। আছে কিন্তু মাফ পাওয়া গেলে আর কে দিতে যায়? জমির ফসল যেবার বেশি তুলিস সেবারে ত জমিদারকে এক পাই পয়সা বেশি দিস্‌নে—তবে? তবে খাজনা মাফের কথা আসে কি করে?"

"ওরা বল্‌ছে আমাকে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে—"

"আপনি যাবেন না, দেবতা—"

"যাব ভাবছি—যদি কিছু পাওয়া যায়। প্রজারা দেবে না বলে ত আমার খরচ আর কমে যায়নি! সরকারকে আমার দিতে হয়। বাপপিতাম'র আমলের তের পার্ব্বণও পালতে হয়। তাছাড়া খোকা শহরে থেকে পড়ছে।"

"আপনি এখানে বসে থাকুন দেবতা—আমি যাচ্ছি মহালে—একা একদম। একটি কড়া অবধি খাজনা আদায় হয়ে চলে আসবে।"

একটু খুসীই হয়ে ওঠেন শিবরাম রায়। খুসী হয়েই বলেন: "কিন্তু তোর কি আর সেই নাম-ডাক আছে জয়া?"

ছাতিটা ফুলিয়ে তুলতে চেষ্টা করল জয়া। এখন আর তাতে পেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠেনা বরং উঁচু হয়ে ওঠে রগের আঁকাবাঁকা দাগ: "বলেন কি দেবতা? জয়ামাল বেঁচে থাকতে শশীদলের রায় বাড়ির খাজনা আটক হবে?"

শিবরাম রায় যেন একটু চমকেই ওঠেন: "কিরে! তুই গিয়ে ওদের মারধোর করতে সুরু করবি নাকি?"

জয়া একটু লজ্জিতই হল যেন: "মারধোর করতে ত হয়না—"

"যেতে হয় যা—কিন্তু খবর্দ্দার গোলমাল হাঙ্গামহুজ্জুত করিসনে কিছু—নায়েববাবুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাবি সদানন্দর কাছে।" শিবরাম রায় পা গুটিয়ে নিলেন।

জয়া দাঁড়িয়ে গেল। শিবরাম রায় আবার ডাকলেন তাকে: "ভরতকেও না হয় সঙ্গে নিয়ে যা—বাপব্যাটা দুজনেই যাবি।"

"সে যাবে না, দেবতা। বড় হয়েছে, বৌ ঘরে এসেছে—হুকুম ত আর করতে পারিনে!"

"ভীরু! শঙ্করের মতই।"

"কোথায় ছোটবাবু আর কোথায় ভরত, দেবতা! ছোটবাবু রাজার ছেলে—রাজা! জয়ামালের ছেলে ভরত পুঁটি মাছ।"

"তা পুঁটি মাছেরও ত বাঁচা চাই, পুকুর-দীঘি না-ই বা হল একটা কুয়ো ত দরকার!"

"দেবতা আছেন—আমাদের মারে কে?"

"তা নয়রে জয়া—বিষয়-আশয় স্রোতের জল, কখন আসে কখন যায় ঠিক ত নেই!"

"শশীদলের রায়বাবুদের মহাল, দেবতা, চন্দ্রসূয্যি—বাপঠাকুদ্দার মুখে তাই শুনেছি আর দেখছিও তাই। মকুবপুরের নন্দীদের মতো পাপ ত লাগেনি এ বংশে—স্রোতের জল হবে, দেবতা, কোন দুঃখে?"

"পাপকে চোখে দেখা যায় না—নলের দেহে যেমি কলি প্রবেশ করেছিল, আমাদের সবারই সেই অবস্থা। কবে, কোথা দিয়ে ঢুকে পড়েছে পাপ ভগবানই একমাত্র জানেন।"

"খোকাবাবু যাওয়া অবধি আপনি ভেঙে পড়েছেন, দেবতা।"

"তা নয়। বয়েস ত হল। এবার মরতে হবে যে! যা বলছিলুম শোন্—বাজারের ধারে মঠটার গা-ঘেঁসে চার কাণি জমি নিয়ে নে—দুফসলী জমি—ভরত চাষাবাদই করুক। কবে মরে যাই—মরবার সময়ও শান্তি হবে না, ভাব্‌ব তোর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলুম না।"

জয়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিল—হঠাৎ উবু হয়ে পড়ে শিবরাম রায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরল—জীবনে এই প্রথম কেঁদে ফেলল জয়ামাল: "না না দেবতা—জমি আমি নোব না। জয়ামালের চোদ্দ-

পুরুষ রায়বাড়ির পুষ্যি—আমাকে কোন অপরাধে আপনি আলাদা করে দিচ্ছেন? মাথা খুঁড়ে আমি মরে যাব—তবু এক ফোঁটা জমি নোব না।"

শিবরাম রায়, মনে হল, বিপদে পড়লেন। জোর-জার করেই পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন: "কি এক সামান্য ব্যাপারে কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলি তুই? আমি ত তোকে গছিয়ে দিচ্ছিনে জমি—না নিস না নিবি। ত্যাখো—তবু কাঁদে! আঃ—জয়া চুপ কর।"

চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল জয়া। শিবরাম রায় হেসে বললেন: "থাক বাপু—তোকে জমি দিয়ে পাপী হবার দরকার নেই আমার।"

সমস্ত ব্যাপার শুনে ভরত খুসী হতে পারল না। ক্ষেত হচ্ছে লক্ষ্মী। ছিদ্দিক ওরা এবারেও সতেরো মণ ধান তুলল—বছরের জন্য প্রায় নিশ্চিন্ত। রসিক নমঃ পাটেই পাবে হয়ত দুশো টাকা—তাইত এবার তার মনসা পূজোর ধূম। ভরতের বউ সুবর্ণ ত দস্তুরমত গোসা-ই করে বসল—চাঁপাতলার চাষীর মেয়ে সে—বাপের বাড়ির ধানের গন্ধে মানুষ, ছুটোপুটি খেয়েছে ক্ষেতের ফসলে—এখানে এসে খাঁ-খাঁ মরুভূমি। ভাগ্যিস বাপ্পা বেঁচে নেই—জয়ার সঙ্গে আজ তাহলে এক পশলা কুরুক্ষেত্রই হয়ে যেত—রাতদিন জমিদার বাড়িতে পড়ে থাকলেই যে সংসার তরতর করে চলে যায় না, কথায় না পারে কাজে তা সে আজ বুঝিয়ে দিত।

জয়াকে এখনো ভরতের ভয়। এখনো যে খুব বেশি লাফ-ঝাঁপ করে জয়া, গলা ফাটিয়ে কথা বলে, তা নয়—তবু ভরতের ছোটবেলার ভয়টা যেন মনে কায়েমী হয়ে গেছে। সুবর্ণের সঙ্গে বাপকে নিয়ে

হয়ত হাসিঠাট্টাও করে অনেক কিন্তু বাপের ছায়া দেখলেই ঠোঁট আর চোখের পিণ্ড পড়ে ঝুলে। "কি এত গুণী বাপরে যে তার সামনে ভয়ে শুঁটকী হয়ে থাকতে হবে!" সুবর্ণ বলেছে অনেক দিন। ভরত অনেক দিন প্রতিজ্ঞা করেছে মনে-মনে যে আর সে চুপ করে থাকবে না। আর এক আধটা প্রতিবাদ মুখে নিয়ে এগিয়েও যায়ঃ "ক্ষেতটা চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল তোমার—"

"ক্ষেতখামারে শরীরের রক্ত জোলো হয়ে যায়—জানিস্ ভরত! লোকে বল্‌বে জয়ামাল চাষী হয়েছে—স্বগ্‌গে থেকে বাপঠাকুদ্দা থুতু দেবে।"

দোরের পেছনে সুবর্ণ চোখ কাণ পেতে আছে—ভরতের সাহস ফুরিয়ে আসে নাঃ "কি যে বল! সিরাজকে দেখেছ? দুকানি ক্ষেত একা চষে দিনাদিন। কি তার ড্যানা—গুল্‌তির গুলি টং করে ফিরে যায়—গরুতে গুঁতিয়ে দিয়েছিল উরুতে, একটু চিড় ধরল না। সিনাটা একবার খেয়াল করে দেখো—মনে হবে কাঁঠাল কাঠের সার দিয়ে তৈরী।"

"পাঞ্জা লড়বে তোদের সিরাজ আমার সঙ্গে?"

"তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আসবে কেন? কিন্তু তুমি যে বল্‌ছিলে রক্ত জোলো হয়ে যায়—তাই বল্‌ছিলুম।"

"আসগরের কাছে সিরাজ কি রে?—একটা টিক্‌টিকি। সিরাজের চাচা আস্‌গর—এক ওস্তাদের সাকরেদ আমরা!"

"আস্‌গর চাচার কি ক্ষেত ছিল না?"

"ছিল—তাইত ধরল বাতে। পঞ্চানন কোব্‌রেজের অত ভালো তেলও ফক্কিকারি হয়ে গেল।"

"এ গাঁয়ে তুমিই একটা মানুষ, যার ক্ষেত নেই।"

"আমি গাঁয়ে মানুষ নই—গাঁয়ের মুরোদ।"

ভেতর থেকে সুবর্ণ ফুঁসিয়ে উঠছিল একেকবার। শ্বশুর ত বদ্ধ পাগল নয়--কি আর তাকে বলা যায়! তবু সুবর্ণ ছোট করে ঘোমটা তুলে একটা কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখের মুচড়ানো ভাবটা লক্ষ্য করলে জয়া: "বড়লোক চাষীর বেটি, বৌ বুঝি তোকে সলা দিয়েছে—কেমন রে ভরত ?" জয়া হাসতে লাগল।

যেটুকু ভরতের বাকি ছিল এবার তা হয়ে গেল। ঘাড় গুঁজে মাথা চুল্‌কে বল্‌লে: "বৌ ?—না বৌ কেন বলবে ?"

"ও বল্‌তে পারে। মুগমাষ লঙ্কাহলুদ তিলতিসি ধানপাটে বেটির বাপের বাড়ি গমগম করছে কি না!" সুবর্ণ ওসব কথা শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকেনি—চলেই যাচ্ছিল—জয়া ডাকলে তাকে: "বৌ—শুনে যা।"

অস্পষ্ট একটু হাসি নিয়ে দাঁড়াল সুবর্ণ।

"ক্ষেত যদি তোরা চাসই, সে আর বেশি কি কথা ? জমিদারের কাছে হাত পাতলেই মঞ্জুর। সে হয়ে যাবে, ভাবিস্ নে। কাল আমি মহালে যাচ্ছি—ভোরবেলা, শেষ রেতেই বলতে পারিস। চাট্টি ভাত ফুটিয়ে ত দিবি, বেটি!"

শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম নেই--কিন্তু এম্নি করে সুবর্ণ হেসে ফেল্‌লে যার পর কথা না বলবার অসুবিধা আর কিছু থাকে না।

নৌকা ঘাটে জয়াকে তুলে দিয়ে ভরত যখন বাড়ি ফিরল তখনও ঠিক ফর্সা হয়নি। সুবর্ণ জল-কাদায় ন্যাতা দিয়ে ঘরের পৈঠায় বেদম পরিশ্রম করছে।

"হাঁপিয়ে উঠেছ যে—" সুবর্ণকে একটু খুসী করবার জন্তই ভরত বলে।

"ভারিত তোমার দুটো খুপ্‌রী—চাঁপাতলায় এককে দিন সাত-সাতটা ঘর লেপে দিইনি?" সুবর্ণরও বলবার মতো কিছু-না-কিছু পুঁজি আছে। ভরত প্রথমটায় একটু মুষড়ে যায়। তারপর ভাবে খোসমোদই সে করতে এসেছে যখন, এতে বরং সুবর্ণর ক্ষমতার তারিফ করবারই সুযোগ পাওয়া গেল।

"তা সাতটা কেন—একশোটাও তুমি লেপে তুলতে পারো—শরীর বেশ মজবুত আছে। কাজ এত করতে পারো বলেই না গায়ে ফুঁ দিয়ে আছি—ভাবি এককে সময়, কাজটা ভালো হচ্ছে না—বাড়ি ফিরেই ঝাড় থেকে ক'টা কঞ্চি কেটে এনে লাউ-এর মাচাটা তৈরী করে ফেলব এবার—কিন্তু তোমার জন্যে কি আর কাজ করবার যো আছে, এসে দেখি মাচা তোয়ের।"

"কাজ খুঁজে পাওনা বলেই ত বলেছিলুম ক্ষেত নাও। সারাটা দিন ত শুধু টইটই করে ফিরচ্—বাপের রোগে পেয়েছে!"

"কাজ করি। জানি কাজ—কিছু ভেবোনা। মনসার মূর্ত্তিটা দেখলে অবাক হয়ে যাবে।"

"আমার আর অবাক হয়ে কাজ নেই—তোমার বন্ধুরা অবাক হলেই হল।"

"তাই বলছিলুম—এক্ষুনি আবার যেতে হবে। আনা দুয়েক পয়সা হবে সুবর্ণ? কিছু হত্তেল কিনে নিতুম। সাপের গায়ে কালো চড়িয়ে এসেছি—একটু হলুদ বুলিয়ে দিলেই ব্যস্।"

"হত্তেলের পয়সা, যাদের বাড়ি পূজো, তারাই দেবে—তুমি দেবে কেন?"

"মূর্ত্তিটা আমি ওদের করে দিলুম, ও আমার মাঠৎ। দু' আনা পয়সার জন্তে আবার ওদের কাছে হাত পাত্‌ব ?"

"পয়সা আমার কাছে কোথায় ?"

"নেই ?"

"দিয়েছ একটা কাণাকড়ি কোনদিন ?"

"বাবা দিয়ে যায়নি ?"

"তোমারই ত বাবা সে। জমিদার বাড়ি থেকে ভেট এলে তোমরা খাও। কোথাও এমন দেখিনি জন্মে।"

"মার কুলুঙ্গিতে থাকৃত ত দু'চার আনা।"

"একটা সিকা টাকা পড়ে আছে—শ্বশুর বল্‌ছিল তোমার ছেলে হলে পাটা তৈরী করে দেবে।"

সুবর্ণ ফিক্ করে একটু হেসে ফেলে। ওর ফুলো-ফুলো গালের কালো চামড়ায় সুন্দর একটু টোল পড়ে। ভরত আনমনা চেয়ে থাকে। বেনেতি দোকানে একটি পয়সার ধার মিলবে না। চাইতে হবে রসিকের কাছেই পয়সা। সমস্ত বাহাদুরীটাই তার পণ্ড হল। অনেক অনিচ্ছায়ই পা বাড়ায় ভরত। সুবর্ণ পেছন থেকে ডেকে বলে : "সকাল সকাল বাড়ি এসো কিন্তু—"

কোনো উত্তর দিলনা ভরত।

"আর জমিদার বাড়ি থেকে বরাদ্দটাও তুমিই আন্‌বে ত আজ ?"

মাথা নেড়ে একটু থেমে রইল ভরত। তারপর হন্‌হন্ করে পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বরাবর গিয়ে উঠ্‌ল ভরত জমিদার বাড়িতেই। বরাদ্দ আদায় করতে। কার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সে জানে না। বাজার-সরকারের সঙ্গে যুঝে-পিঝে জয়মাল রোজই একটা সিধে আদায় করে নেয়। এতদিন সে খবর রাখবার দরকার পড়েনি ভরতের। ঢুকে পড়ল সে বরাবর শিবরাম রায়ের সদর বৈঠকখানায়।

তামাকের নল থেকে মুখ আলগা করে শিবরাম চাইলেন ভরতের দিকে।

"আমি জয়মালের ছেলে কত্তা—"

"চিনি, চিনি। কেন? খবর কি?" শিবরাম রায়ের চোখে মোলায়েম চাউনি।

"বাবা মহালে চলে গেছে—"

"তাত আমি জানি।"

"ঘরে একটাও পয়সা নেই কত্তা—"

"বলে কি? কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই দেখছি জয়ার! তা একটা টাকা অন্ততঃ নিয়ে যা নায়েববাবুর কাছ থেকে চেয়ে—দাঁড়া, আমি বলে দিচ্ছি।"

টাকাটা হাতে নিয়ে বাজারের পথ ধরে ভাব্‌ছিল ভরত একেই হয়ত ভিক্ষে বলে। জমিদারের কাছে হাত পাতবার সময় হয়ত মুখটা তার ভিখিরির মতই হয়ে উঠেছিল। তা দেখে দয়া হল জমিদারের। কাছারিতে হুকুম দিয়ে দিলেন খয়রাৎ বাবদ একটা টাকা দিয়ে দিতে। হাতের মুঠোয় টাকাটা ভরতের গরম হয়ে উঠল।

"ওইটুকু হক্তেল দিলে দু আনায়, উদ্ধবদা ?"

"ওতেই তোর বোয়ের মুখ দুগগোর চেয়ে জাকাল দেখাবে।"

বস্তার আর মসলার একটা ভুষো গন্ধ নাকে টেনে নিতে নিতে ভরত ভাবতে থাকে—ঐটুকু হক্তেলে সাপের গা-টাই কুলোবে না—আরো দু আনা খরচা না করে উপায় নেই। খানিকটা নীল আর গিরিমাটি নিলে কেমন হয়? শিবের মেয়ে ত মনসা, বাখারির জালি তৈরী করে যে সে কাপড় দিয়েছে তাতে এক পোঁচ গিরিমাটি দিয়ে দিলে কিন্তু তোফা দেখাবে। আর নীল আর হক্তেল গুলে পদ্মপাতার রং। জরীণ ফিতে আর চুমকির দিকেও ভরতের নজর যায়, দু তিন গাছি পুঁতির মালার রং-ও মনে মনে পছন্দ করে ফেলে সে।

বাজার থেকে যখন বেরিয়ে এল ভরত, টাকাটা তখন রং, ফিতে আর পুঁতির মালা হয়ে গেছে। বাঁশতলার ঢালু পথে গড়গড় করে পা চালিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। বাঁশের গুড়ির ফাঁকে-আড়ালে বাসকের ঝোপ—বাসক ফুলের একটা পাতলা সুগন্ধ ওখানকার বাতাসে। গুণগুণ করে গান ধরল ভরত: "তোর তত্ত্ব আমি ভালো জানি লো মনসা, তোর তত্ত্ব আমি ভাল জানি—"

হুঁকোটা ভরতের দিকে এগিয়ে দিয়ে রসিক বলে: "দুটান দিয়ে নে দিকিন—বেহুঁস হয়ে এক নাগাড়ে ত রং-ই লাগিয়ে চলেছিস্।"

রসিকের ভাই রাইচরণ একটা বৈঠা বগলে দা হাতে করে এসে দাঁড়ায়: "রং-এ জবর খোলতাই হয়েছে ভরতদা—"

ভারত হুঁকোটা টান্‌তে টানতে চোখ তুলে রাইচরণের মুখের দিকে তাকায়।

"কি বল দাদা, একেবারে পিত্তিমের মত দেখাচ্ছে—" রাইচরণ রসিকের মুখ চেয়ে হাঁ করে থাকে।

"তোরা কজন যাচ্ছিস?" রসিকের মন পড়ে আছে অন্যদিকে: "আর এক রাতের বিষ্টিতেই কিন্তু বুক-সিয়া জল দাঁড়িয়ে যাবে—ডুবিয়ে পাট কাটতে গেলে জনের খরচা ঢের।"

অন্যমনস্ক হাতে হুঁকোর নলচেটা আঁকড়ে ধরে রাইচরণ বল্‌লে: "আধা-আধি আজই তুলে দোব দেখো।"

অনিচ্ছুক শিশুকে মাই ছাড়ানোর মতো করেই হুঁকোটা ভরতের মুখ থেকে কেড়ে নিতে হল রাইচরণের। অথচ কারিগরির এত সুখ্যাতির পর ভরতেরই সেধে হুঁকোটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। মাথায় ওর কিছু নেই।

ছিদ্দিককে আসতে দেখা গেল। লুঙ্গিটা পায়ের গোড়ালি অবধি নেমেছে। পাট-কাটার কাজ তবে ফুরিয়েছে তার। লম্বা করে সুখটানটা দেবারও অবসর হলনা রাইচরণের। হুড়দাড় করে খালের জংলা পথে সে নেবে গেল।

"পাট ভেজানো হল তোর ছিদ্দিক—" রসিকের তালু যেন শুকিয়ে উঠেছে।

"বিলেই মাচা করে রেখে এলুম।"

"ক' মণ দাঁড়াবে?—"

"আল্লার দোয়ায় ষাট সত্তুর হবে।"

"অথচ আমারটা স্থাথ কাটাই হলনা—জনকে খাইয়েই পাটের পয়সা উড়বে এবার সব।"

তন্ময় হয়ে গিরিমাটি দিয়ে মনসাকে শাড়ী পরাচ্ছিল ভরত। উবু হয়ে তার পাশে বসে পড়ে ছিদ্দিক বললে: "ভরত কিন্তু আচ্ছা কারিগর—কি বলিস রসিক ?"

"বাজারে রং নেই—বললে ভাদ্রের আগে চালান আসবে না, নইলে দেখতিস্ ছিদ্দিক—" ভরত ছিদ্দিকের মনের কাছে নিজের ক্ষমতাটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ধরতে চাইল।

"মহরমের তাজিয়া তৈরী করতে তোকে এবার সহরেই পাঠিয়ে দোব !"

রসিক আরেক ছিলিম তামাকের যোগাড়ে ছিল। মনের আশঙ্কাটাকে ধুঁয়োয় ঢেকে ফেলতে না পারলে আর চলে না।

"আলিসান পিত্তিমে ত তৈরী করছিস্, গানবাজনার কি ব্যবস্থা করলি, রসিক—" ছিদ্দিক বলে।

"আর গানাবাজনা—" রসিকের মেজাজ তখন সপ্তমের দিকে।

"রোজই ত হচ্ছে সন্ধ্যার 'পর, কাণে তুলো দিয়ে ঘুমোস নাকি ?" ভরত তুলি চালাতে চালাতে উত্তর দেয়।

"সনাতন আসে ?"

"মনসার গান সনাতনকে দিয়ে হয়না। এ আর জমিদার বাড়িতে বসে টুং-টুং দোতারা বাজানো নয়।"

"সনাতন গায়ও ত ভালো !"

"সে গান বাঈ-নাচের সঙ্গে চলে—দশরার পানসীতে বসে

পিন্‌-পিন্ করে, শুনিস নি, 'পোষ না মানে জংলা পাখী, জংলা পোষা হল দায়' !"

তামাকটা খেতেও ভালো লাগে না রসিকের। দু'একটা টান দিয়েই জল ফেলে হুঁকোটা রসিক এগিয়ে দেয় ছিদ্দিকের হাতেঃ "বুঝ্‌লি ছিদ্দিক, তোরা সব পরিষ্কার হয়ে গেলি অথচ আমার দশাটা দেখ একবার !"

"দু'রোজে তোর কাটা শেষ হয়ে যাবে—তার জন্যে এতটা কি ভাবনা লাগিয়ে দিয়েছিস ?"

"ভাবনা হয়। বুড়ো-বাচ্চা নিয়ে পনেরোটা মুখ বাপু, ঢেঁকি পাড়িয়ে বৌয়ের পায়ে কড়া পড়ে গেছে !"

"সে আর বলিস কেন ? আমার বাড়িতেও ত কেল্লার ফৌজ পিলপিল করছে।"

"ক্ষেতপাথরের কথা বলে বলে এবার তোরা পূজোর ফুরতিটাই মাটি করবি—" ভরত বিরক্ত হয়ে বলে।

"শোন্ শালার কথা ছিদ্দিক, জমিদারের সিধে খেয়ে শালার কথাটা শোন্ একবার—" রসিকের মেজাজ আরো তেতে যায়।

"ক্ষেত থাকৃত ত বুঝত—" ছিদ্দিকও রসিককে ঘেঁসেই কথা বলে।

হঠাৎ কেন যে চন্ করে মাথায় খানিকটা রক্ত উঠে গেল ভরতের ! মাটির মালসায় তুলিটা গুঁজে দিয়ে সটান সে দাঁড়িয়ে গেল : "কত শালার কত ক্ষেত আছে আমি জানি ! জমিদারের পায়ে মুখ ঘসে ত একেক জন ক্ষেতেল হয়েছিস। তারই আবার ধমক কত !"

মস্ত শরীরটা নিয়ে রসিকও উঠে দাঁড়াল : "জমিদারের পায়ে

মুখ ঘসেও ত এক কড়া ক্ষেত হলনা তোর! মুখ ঘসে মুখ ভোঁতাই করলি।"

"ছিদ্দিক শুন্‌লি? ছোট জাত শালার কথার রকম শুন্‌লি?" ছিদ্দিকের জোয়ান শরীর ঘেঁসে ভরত দাঁড়ায়।

"ভারি আমার বামুনের গুরুঠাকুর রে—তবু যদি জমিদারের গোলামি না করতিস্!" এক্ষুনি যেন ভরতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এম্নি করে রসিক দু পা' এগিয়ে এল।

"তুই-ও ক্ষেপেছিস্ রসিক—যা দিকিনি ঘরে।" ছিদ্দিক হাত নাড়তে থাকে।

একপাল ন্যাংটো উদলা-গা ছেলে বেড়ার এধারে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের বড়রা এক একটা নেংটি পরা—ভয়ে-ভয়ে পেছনে দাঁড়াল। পাকাটির বেড়ার ওধারে বৌ-ঝিয়ের রেশমী চুড়ির আওয়াজ বাজছিল। রসিক হয়ত ঘরের দিকেই যেত। বাড়ির মানুষদের ভীড় দেখে একটু লজ্জা পেয়েই যেন আবার ফিরে দাঁড়াল। ভরতও মুখে আরেকটা কি কথা যেন শানিয়ে আন্‌ছিল—ছিদ্দিক তার প্রকাণ্ড হাতের একটা থ্যাবড়ায় ভরতের মুখটা বন্ধ করে দিলে।

"চল্ বেকুব—নেই কাজে মিছামিছি ঝগড়া!" অনেকটা আলগি দিয়েই ভরতকে ছিদ্দিক ওখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকবার আগেও ভরতের খেয়াল ছিলনা যে সুবর্ণ সিধের জন্যে বসে আছে। ভরতের পায়ের শব্দ সুবর্ণের চেনা। রান্নাঘর থেকে একটা সাপের মতই সে বেরিয়ে এল।

"বেশ তোমার আক্কেল! ভর দুপুর বেলা খালি হাতে এসে হাজির হয়েছ—তোমার বার চেয়ে আমি বসে আছি এদিকে!"

"কিছুই নেই না কি ঘরে?" একটু গম্ভীর শোনাল ভরতের গলা।

"আমার হাত-পাগুলো কেটে রান্না করে দিলে পারি।"

"তবে তাই দে—" ভরত বিরক্ত হয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে।

"কেন তার আগে আমার বাপের ঘর নেই? ওরা আমায় ফেলে দেবে, না উপোসে মারবে?"

"তা বেশ, চলে যা—"

"যাবই ত। বোচন মাঝি চাঁপাতলা যাচ্ছে তার কাছে খবর দিয়ে দিয়েছি। কি সুখেই রেখেছ—আবার লম্বা লম্বা কথা!"

"আমারও ত বোনের বাড়ি বলে একটা জায়গা আছে—যাব চলে দুগগোর ওখানে।"

"তা গেলেই হয়—আমি ত কাউকে আটকাইনি।"

খুব সাংঘাতিক রকম একটা ঝগড়া করবার ইচ্ছা ভরতের ছিল না। তেমন বিষই যেন তার নেই। তাছাড়া রসিকের বাড়িতে অনেকটা বিষ খরচও হয়ে গেছে। আর সুবর্ণেরও অস্ত্র প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। মিথ্যে করে বাপের বাড়ির ধমকটা দিয়েও কোনো কাজ হল না। সুবর্ণের মনেই বাপের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা নেই—তাই সে ভাবে এ ইচ্ছার চাপ তার মনে যেমন ভরতের মনেও তেম্নি কাজ করবে। কিন্তু ভরত যখন অনায়াসে তা সয়ে যেতে পারে, সুবর্ণকে অগত্যা কাঁদতে হয়। গৃহস্থের মেয়ে সে, মান-অপমান জ্ঞান খুবই বেশি। মুটে মজুরের মেয়ে ত সে নয় যে, কোনো অবস্থায়ই তার কাঁদতে নেই।

"এক বেলা ত মোটে শ্বশুর ঘর-ছাড়া—তাতেই আমার এই!" সুবর্ণ ঘরে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দিলে। মনটা তেতো হয়ে গিয়েছিল ভরতের। পায়ের গোড়ালিটা পৈঠাতে বার কয়েক ঠুকে সে দাঁড়িয়ে গেল। বেরুতেই হবে। কয়েক মুঠো চাল-ডাল যোগাড় না করলে চলে না।

চেঁচামেচি করে পথ থেকে ভরতকে প্রায় টেনেই আন্‌লে মনমোহন তার দোকানে। ষাটের কম হবে না মনমোহনের বয়স, তবু তার হাপর নিভল না, বন্ধ হল না হাতুড়ির আওয়াজ।

"শোন্—শোন্ নাতি—চোখে আর মানুষ লাগে না যে রে বড়!" মনমোহন ভরতকে ডাকে। কয়লার গাদির উপর থেকে পিঁড়িটা টেনে এনে ভরত জড়সড় হয়ে বসে।

"দিব্যি পিত্তিমে নাকি করেছিস নাতি? দ্বারিকা আচায্যি বল্‌ছিল—খাসা বাঁশের কাজ! লেঠেলের ছেলে বাঁশের কারিগর!" ফুঁপিয়ে হেসে উঠল মনমোহন।

"ভালো আছ, দাদা?" জিজ্ঞাসা করলে ভরত।

"যাক্ তবু খোঁজটা নিলি!"

"তোমার খোঁজ কি আর ডেকে নিতে হয়—হাতুড়ির বাড়িতেই ত গাঁ শুদ্ধু লোককে জানান দিয়ে দাও।"

"কোথায়?—ন'মাসে ছ'মাসে শুন্‌ছিস একটিবার হাতুড়ির আওয়াজ? কাস্তে-দা কুড়োলকে শুধু নুন-জল খাইয়ে দেওয়া—বড় জোর শান দিয়ে দাও। শুন্‌ছি রাজচন্দ্র সা বাজারে দা-কুড়োলের

দোকান করবে—সহর থেকে কারখানার তৈরী মাল আন্‌বে। তারপর আর কি! আমার হাপর ত নিভ্‌ল।"

"তা তোমাকে গাঁয়ের লোক ছাড়বে কেন?"

"রাইচরণ বল্‌ছিল সহরের মাল না কি সস্তা—গায়ের মেহনৎ ত নাতি—যে দরে দিচ্ছি তার কমে আর দেওয়া যায় না।"

ভরত চেয়ে থাকে মনমোহনের মজবুত শরীরটার দিকে। কে বল্‌বে এ শরীরের এত বয়েস? খুব নজর করলে দেখা যায় পেশীগুলো একটু নরম হয়ে এসেছে, তবু তা চুল আর মুখের বয়েসের সমান নয়।

„মুরারি কাকা কোথায় দাদা?"

"নবীনগর—যাত্রার দলে। বউ আর চারটে নাতি-নাত্‌নি এখেনে পড়ে আছে, দু' তিন মাসে পাঁচটা টাকা পাঠায়। তাছাড়া রুক্মিণী তার কাচ্চাবাচ্চাগুলো নিয়ে আমারি ঘাড়ে। সে-ও ত মেয়ে—ফেল্‌ব কোথায়? এগারোটা মুখ, নাতি—এই বুড়োর হাতুড়ির উপর হাঁ করে আছে!"

মাথাটা কেমন একটু ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে ভরতের। পাল পাল ছেলেপিলের মুখে সবারই ভাত দিতে হয়। কোনো রকম করে ভাত তারা দেয়ও। কিন্তু একজন মাত্র মানুষকে একটা দিন সে ভাত দিতে পারে না! কোত্থেকে আনে এরা ভাত—এই ছিদ্দিক, রসিক, বোচন, মনমোহনের দল? দু' চার কাণি ক্ষেত আছে কারো—কারো বা তা-ও নেই, শুধু একটা শরীর। পারবে কি এরা সবসময়েই এদের ছেলে-পিলেকে খাইয়ে যেতে? নিশ্চয়ই পারবে না। নিঃশ্বাস ফেলে হাল্কা হয়ে নেয় ভরত—তার যে ছেলেপিলে নেই!

আগুনের তাত-লাগা ফাটল-ধরা মুখটাতে একটু হাসি এনে মনমোহন বলে : "জয়া মহালে গেছে—দেখা করে গেছে কাল। বল্ছিল, কাকা, ভরত একা রইল খোঁজ খবরটা নিও।"

মনমোহনকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল বলে ভরত এখন লজ্জায় চুপ্ সে গেল।

"খোঁজ খবর নোব সে-সাধ্যি আমার কোথায় নাতি? চৌপহর এই কপাল-কোষ্ঠী আগ্‌লে বসে আছি!"

বরং বুড়ো মানুষটার তত্ত্বতালাসি নেওয়া ভরতেরই উচিত। ভরত মনে মনে নিজেকে গাল দিতে সুরু করে। তাতেই তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়।

"একটা কথা ছিল দাদা—" ভরত খানিকটা সাহস দেখিয়ে ফেলে।

"কি বল্‌ত! বোচনকে আল তৈরী করে দিতে হবে? তা দিয়েছি ত, ছ' গণ্ডা পয়সায় এককুড়ি আল। সহরের মালও অত সস্তায় পাবে না নাতি!"

"না-না তা নয়। বাবা এলেই দিয়ে দিতুম—দু'গণ্ডা পয়সা দিতে পার?"

"হারে শালা—ভদ্দরলোক বনে গেছিস্! দু'গণ্ডা পয়সা চাইবে তার আবার কত ধানাই-পানাই—যেন লজ্জায় মাথাকাটা যাচ্ছে! এখনো যে ট্যাঁকে বোচনের ছ'গণ্ডা পয়সা কড়কড় করছে রে—ঠিক করে বল্‌ত কত চাই।" হাতের চেটোয় পয়সা ক'টা বিছিয়ে ধরল মনমোহন।

"দু'গণ্ডা হলেই চল্‌বে।" দুটো আনি কুড়িয়ে নিলে ভরত।

"জয়ার ছেলে তুই এতো কুটিল হয়েছিস্—অ্যাঁ ?"

কেন যে ভরত আর ওখানে থাকতে পারছিল না বলতে পারবে না। শুধুই ভাবছিল—গাঁয়ে রসিকই শুধু নেই, মানুষও আছে !

দুয়ারের খাটো বেড়াটা এক লাফে পেরিয়ে এসে ভরত বল্‌লে : "বাবা এলেই পয়সাটা দিয়ে দোব দাদা—"

তার পেছনে মনমোহনের গলা তাড়া করল : "পয়সা হাতে করে এ দুয়োর পার হবি ত—এই লোহাপেটা হাত দেখছিস ? মনে থাকে যেন !"

বিকেল গড়িয়ে না আসতেই সিরাজ আর ছিদ্দিক এসে উপস্থিত। পাতলা দাড়িতে এখনো সোনালি রং কালো হয়ে ওঠেনি—মুখের আদল তাই স্পষ্ট দেখা যায়। ভরতের শরীরও খারাপ নয়, তবু ওদের কাছে তাকে মনে হয় ইঁদুরের মত।

"দিব্যি খেয়েদেয়ে ঘুম দিচ্ছিস্—কেমন রে ভরত ?" ছিদ্দিক উঠোন থেকেই চেঁচিয়ে বলে।

ভরত মাদুরটার ওপর উঠে বসে। একহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে চলে যায় সুবর্ণ।

"একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলুম আর কি !" ভরত আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে। সুবর্ণ উঠোনে দুটো পিঁড়ি পেতে দিতে বেরিয়ে আসে।

"বস্‌তে দিলে কি হবে বাপু—" সিরাজ সুবর্ণকে শুনিয়ে বলে : মুড়ি, গোয়া আর নারকেল-নাড়ু না খেয়ে নড়ছিনে।"

সুবর্ণ একটু হাসির ঝিলিক দিয়ে চলে যায়। মুখটা তার দেখতে পায় দুজনেই। ছিদ্দিক সামলে দেয় সিরাজকে: "নেমন্তন্ন করে ত আমাদের নিয়ে আসেনি! মোয়া-নাড়ু চাইবি কেন?"

"এদিকে কোথায় গিয়েছিলি ছিদ্দিক?" উঠোনে নেমে এসে ভরত জিজ্ঞাসা করে।

"বাজারটা ঘুরে এলুম—শুনেছিলুম ব্যাপারীরা এসেছে—আসেনি। আর এলেও বা কি? এবার ভাই পাটের দর নেই!"

"দর হলেও কি?" ভরত হেসে ফেলে: "হাতে কি কাণাকড়ি রাখবি? ঢেউ-টিন কিন্‌বি—আর বায়না করবি ঢপযাত্রার দল!"

"কি বলিস্!" বুড়ো মানুষের ভঙ্গী করে ছিদ্দিক: "পেট পুষতে হয় ক'টা খবর রাখিস? তবে হ্যাঁ—দর যদি পাওয়া যায়—একটা মস্‌জেদ এবার করে ফেলব, নানী দোহাই পারছে ক'বছর সমানে!"

ভরত অবাক হয়ে ছিদ্দিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক-গুলো লোককে শুধু খাইয়েই যাচ্ছে না ছিদ্দিক, মসজিদ তৈরী করবার মত টাকাও হয়ত তার আছে। কত আর বয়েস তার? ভরতের চেয়ে বছর খানেকের বড় হবে। অথচ মাত্র একটি বেলার জন্যে স্ত্রীর আর নিজের খাওয়া যোগাড় করতে মনমোহনদাদার কাছে তাকে হাত পাততে হল!

"কি রে ভাই মুড়ি চাইতেই যে তোর বউ ডুব মেরে দিলে—" সিরাজ ভরতকে জোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

"ডুব মারবে কোথায়? খুঁজে দ্যাখ আছে ধারে কাছেই—" ভরত মিনমিনে গলায় বলে।

"চলে যাচ্ছে দেখলুম—বোচনের বাড়ির দিকে—"

"বউ নেই ত?" ছিদ্দিকের একটু ফুরতি আসে: "তবে বলি শোন ভরত। সকালবেলা কি কাণ্ডটা করে এলি বল্ দেখি?"

"রসিক শালাকে তুই চিনিসনে ছিদ্দিক—"

"চিনি। কিন্তু আপনা-আপনির মধ্যেই ত! রসিক পরে অবশ্যি বল্‌লে যে মেজাজটা তার শরীফ ছিল না।"

"না, না ভরত," সিরাজ মাঝখানে পড়ে বলে: "ঝগড়া করেছিস ত রসিকের সঙ্গে?—খুব ভালো করেছিস। ও হারামি শুধু নিজেরটাই বোঝে—মনে আছে ছিদ্দিক ওবার ও দুমুঠো বীজধান আমাকে দিলেনা।"

"কি আজেবাজে বক্‌বক্ করে! ওর ছিলনা দেবে কোথেকে? রসিক সত্যি বল্‌লে, ভরত—'ভালো কাজ করলাম না রে ছিদ্দিক, ভরতটা একটা মাস ধরে পড়ে পড়ে খাটছে আর ওকে যা তা বলে দিলাম।' লোক খারাপ হলেই কি দিলের দরদ বেমালুম ভুলে যায়?"

তামাকের সরঞ্জামগুলো এগিয়ে আন্‌তে আন্‌তে ভরত বলে, "ব্যাগার খেটে দিই কিনা—তাই ওর গায়ে বাতাস লাগে না। তাঁতিপাড়ার মথুর আমাকে বলেনি মনসা তৈরী করে দিতে—একটা টাকা নিয়ে কত সাধাসাধি।"

"তুই করতে পারিস নে পূজো?" সিরাজ জিজ্ঞাসা করে: "দেখতিস্ কি নাচগান আর ফুরতি লাগিয়ে দিতুম।"

"বাবা দেয় না পূজো করতে। বলে, বাবুর বাড়িতে পূজো হলেই আমাদের পূজো হয়ে গেল।"

হুঁকোটা দুজনকে সেধে নিয়ে শেষে নিজেই টানতে সুরু করে ছিদ্দিক।

"তোর ক্ষেতেই আমি এ-কার্ত্তিকে জন খাটব, ছিদ্দিক।" হঠাৎ কেমন উদাসীন হয়ে ওঠে ভরত।

"মাথা খারাপ হল তোর?" সিরাজ জোরে জোরে হাসতে থাকে।

হুঁকোর চাপের মধ্যেও ছিদ্দিকের ঠোঁটে একটু হাসি দেখা যায়: "সুখে থাকা বুঝি সয় না?"

"সুখ? একটা পয়সা নেই হাতে—পয়সার দরকার সবারই হয়—আমার তা কই?"

"নোলক চেয়েছে বুঝি, বউ?" সিরাজ ঠাট্টা করে।

"তোরা ঠাট্টা করিস। বল ত ছিদ্দিক ভাই, পয়সা লাগেনা মানুষের? বাবা চলে গেছে মহালে, আর তাই বিকেলে কি খাব ঠিক নেই! সাধে চলে গেল বৌ বোচনের বাড়ি? তোদের খেতে দেবে কি? এক কণা ক্ষুদও নেই ঘরে।"

হুঁকোটা সিরাজের হাতে দিয়ে বোকার মত চেয়ে রইল ছিদ্দিক খানিকক্ষণ।

"গানে যাচ্ছিস ত, ভরত?" খানিক পরে বললে সে।

"কোথায়?"

"রসিকের ওখানে—ঢোল বাজাতে বলছিল আমাকে।"

"নাঃ—যাব না।"

"রাগ যায়নি?"

মুখ তুলে সিরাজ বলে: "রাগ যাবে কি? যেতে হয় ত রসিক নিজে এসে বলুক।"

সত্যি রসিকেরই আসা উচিত। ছিদ্দিক তলিয়ে দেখ্‌লে ব্যাপারটা। একটা হাই তুলে সে উঠে পড়্‌ল।

"শোন্‌ ভরত—" উঠোনের এক কোণায় ডেকে আনল ভরতকে ছিদ্দিক। তার ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোর নিচে এনে মুঠোটা আল্‌গা করে দিলে তারপর: "রাখ্‌ সিকিটে—" একটা সিকি ট্যাঁক থেকে কখন যে হাতের মুঠোতে এনে রেখেছে ছিদ্দিক, মাত্র সে কথাটাই ভাবতে লাগল ভরত, আর কিছু ভাব্‌বার অবস্থা তার তখন ছিল না।

স্নবর্ণ বল্‌ছিল, "তোমার যেন লজ্জা-সরম নেই! তোমার বন্ধুরা এসে খেতে চাইবে—হাতে তুলে কিছু দিতে পারব না, তাতে আমার ত মাথা কাটা যায়!"

নিজের অসহায় অবস্থা ভরত মুখোমুখি দেখতে পেয়েছে সমস্ত দিন। একা হলে তার গায়ে কিছু লাগ্‌ত না—কিন্তু স্নবর্ণ আছে—পরের মেয়ে, তারই ওপর একান্তভাবে ভরসা করে'। একটা মটরদানা গড়িয়ে দেবে দূরে থাক্‌ তাকে পেট ভরে খাওয়াতে পর্য্যন্ত সে পারে না। গাঁয়ের মধ্যে বোধ হয় সে-ই সবচেয়ে গরীব। জমিদারের জৌলুসে জয়ামাল তাদের ঢেকে রাখলে কি হবে, সবাই ত দেখতে পায় ভরতের ছেঁড়া ময়লা কাপড়—স্নবর্ণের হাতে মাত্র দুগাছি কাচের চুড়ি! ছিদ্দিকের বউকে দেখেছে ভরত, রূপোর খাড়ু, বেসর, হাঁস্নলি, ভাউ—আরো কত কি অলঙ্কার গায়ে! বড়লোক হতে ত

চায় না ভরত, খেটে খেতে চায়, চায় কয়েকটা পয়সা তুলে দিতে সুবর্ণের হাতে।

আগ-রাতে ঘুম এলোনা ভরতের। শেষ-রাতে জমিদারের প্যাদা বনমালী এসে যখন ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে তখন তার অঘোর ঘুম। সুবর্ণ হাত দিয়ে ঠেলছিল বলে হঠাৎ ভরত জেগে গেল। ধচমচিয়ে উঠে বসে বললে, "অ্যাঁ—"

"মরে আছিস নাকি গোষ্ঠীশুদ্ধ—অ ভরত—" হুতাশে ডেকে যাচ্ছিল বনমালী।

নিশি-পাওয়ার মত চোখ মুছতে মুছতে ভরত এসে বনমালীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেল।

"কর্ত্তা তলব করেছেন তোকে—জরুরী। আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কেন বনমালীকা? কেন?" ভীত গলায় জিজ্ঞাসা করল ভরত।

"জানিনে। চলনা আপদ!" বনমালী নিজেই চলতে সুরু করলে।

সুবর্ণ এসে দোরগোড়ায় দাঁতিয়েছিল—ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বোবার মত ভরত বনমালীর পেছু নিলে।

কাছারি বাড়িতে একটা ছোটখাট জটলা। বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় শিবরাম রায় বসে আছেন। অসম্ভব গম্ভীর তাঁর মুখ—প্রায় কাঁদ-কাঁদ দেখাচ্ছে। বারান্দার সিঁড়িতে দুই হাঁটুর ওপর কনুই গেড়ে মাথাটার ভর রেখেছেন নায়েবমশাই। সামনের মাঠটাতে সদানন্দ অনবরত পায়চারি করছিল। দু'চারজন মাঝি-মাল্লা, পাইক-মুহুরী হাঁড়ির মত মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ভরত আসতেই সবাই একটু নড়া-চড়া করে উঠল। ভরত ভেবে কিনারা করতে পারছিল না হঠাৎ কেন তার ডাক পড়ল। জমিদারের বিরুদ্ধে কবে কোথায় কি সে বলেছে মনে মনে ভেবে নিয়ে কিছুতেই সে কবুল করতে পারেনি, তার কোনো অপরাধ আছে। তবু অপরাধীর মতই ভীড়ের মধ্যে পা বাড়াল ভরত।

শিবরাম রায়ের মুখের দিকে সবার চোখ। সদানন্দও একটু কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। শিবরাম বোবার কথা বলবার মত পরিশ্রম করে যেন বললেন: "ভরত, তোর বাবা নেই।"

খানিকক্ষণ ভরত হাঁ করে চেয়ে রইল। কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না। তারপর এক-এক করে সবার দিকে অপরিচিতের মত তাকিয়ে খুঁজে দেখল তার বাবা এখানে আছে কি না। নেই—সত্যি এখানে জয়মাল নেই।

"প্রজারা ওকে মেরে ফেলেছে—লাস গুম করে রেখেছে।"

ভরত দৌড়ে গিয়ে শিবরাম রায়ের পা দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল: "না-না, কর্ত্তা—" চোখে নাকে মুখে ভরতের একটা কান্নার ধমক ছিটকে পড়ছিল।

শিবরাম রায় মুখ ফিরিয়ে দূরে বিলের সীমার রেখার দিকে চেয়ে রইলেন। চোখের স্নায়ু তাঁর টনটন করছে। চোখ বুঁজে থাকতেই ইচ্ছা করছিল। তবু চোখ বুঁজলেন না। চোখের ডেলার আশে-পাশে অনেক গর্ত্ত আছে—তাতে অনেক জল জমা হতে পারে। চোখ বুঁজলেন না শিবরাম রায়, পাছে সে-জল গালের উপর বেরিয়ে আসে।

"বুড়িচঙ্গ থানায় লোক পাঠিয়েছেন ত নায়েবমশাই ?" সদানন্দ নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

"হু"—কিন্তু মহালের চৌকিদারকে আন্‌তে হবে, জয়ার লাস ত সে-ই দেখেছে !"

"নৌকোতে এক্ষুনি মাঝিরা চলে যাবে, বেলাবেলিই এসে পৌঁছুবে চৌকিদার।"

ভরত আরেকবার কান্নায় লুটিয়ে পড়ে বল্‌লেঃ "আপনি বলুন কর্ত্তা, বাবাকে মেরে ফেলে নি !"

ভরতের মাথায় একটা হাত রাখলেন শিবরাম রায়। থর থর করে কাঁপছিল তাঁর হাতঃ "আমি বললেই কি জয়া ফিরে আস্‌বে রে—" কথাগুলো ভেঙ্গে কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত শরীরে শিবরাম থর থর করে কেঁপে উঠলেন।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গাঁয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গল। ধরাধরি করে প্রায় বেহুঁশ ভরতকে যখন তার বাড়ির উঠোনে এনে কারা দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল, ঝাপসা চোখ মেলে একবার ভরত চারদিক চেয়ে দেখল—মেয়ে-পুরুষের ভীড়ে বাড়ি তার গিস্‌গিস্‌ করছে—একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রসিক, রাইচরণ, বোচন, সিরাজ আর ছিদ্দিক।

ঘোলাটে চোখে জলের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে ভরত। ছিদ্দিকের নৌকা চালানোতে একটা মোলায়েম ভঙ্গী আছে। তেলের

উপর পিছলে যাবার মত করে ছুৎ-ছুৎ করে চল্‌ছে নৌকোটা—নৌকোর বুকে জল ভাঙ্গার হিস্‌-হিস্‌ শব্দটাও সুন্দর। ছিদ্দিকের দিকে মুখ তুলে তাকায় ভরত: "দেখছিস ছিদ্দিক, সাপলা আর শালুক ফুল!"

"জলে সাপলা ফুল থাক্‌বে না ত ভাঁট ফুল থাক্‌বে?" কড়কড়ে গলায় ছিদ্দিক বলে।

"না বল্‌ছিলাম—আগে ছেলেবেলায় ডুবিয়ে কত সাপলা ছিঁড়েছি!"

"এখনও তুলি সাপলা—শুঁটকীর সঙ্গে ভালো ছালন হয়।"

"ষ্টেশনের দিঘীতে এখন আর এত পদ্ম হয়না ছিদ্দিক—" একটা ধাক্কা খেয়ে ভরত অন্ত কথা পাড়ে।

"হবে না কেন? দিঘীর মাটি খারাপ হয় কখনো? হয় কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। আগে ত খাঁ খাঁ পুরী ছিল চারদিক—এখন কত মানুষ বসেছে—মেলা কাচ্চাবাচ্চা তাদের—ওই বাঁদরগুলোই কুঁড়ি বেরুতে না বেরুতে ছিঁড়ে নেয়, ফুল আর হতে দেয় না!" সেই বাঁদরগুলোর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা যায় ছিদ্দিকের মুখে।

"কুঁড়ি ছিঁড়ে নেয় কেন?" ছেলেমানুষের মত ভরত অবান্তর প্রশ্ন করে।

"পেট ভরে ত খেতে পায় না, উপোসও থাকে অনেক। নাদানের দল সারাদিন তাই খাই-খাই করে। কুঁড়ির টাক-ই বের করে খায়।"

ভরতের চোখের উপর ভেসে ওঠে একপাল নেংটো ছেলে। ধুলোকাদা মাখা গা। সরু সরু হাত পা, বুকের হাড় গির-গির করছে, টিল-টিল করছে পেট, মাথা বড়। কিন্তু চোখগুলোতে অত্যাচারের

হাওয়া লাগেনি—ছোট ছেলেদের মতই তা টলটলে, সুন্দর। ওদের কারু কারু চোখ খুব চেনা মনে হয় যেন ভরতের। একটা চেহারা যেন বদলে বংশীর মত হয়ে যায়—হুঁচোট খেতে খেতে এগিয়ে আসে বংশী, ছোট ছোট হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় ভরতের দিকে—ডাকে : "ব্বাব্বা—"

বংশীকে নিয়ে রোজ এক পশলা ঝগড়া হওয়া চাই। সুবর্ণ বলে : "ঈস্ এখন কতো আদর! ও যখন পেটে কত ভাবনাই ত ভেবেছে, যেন ও এসে তোমার ধান চাল সব গিলে বস্‌বে!"

বলদ দুটোর জন্য খড় পোঁচাতে পোঁচাতে ভরত জবাবদিহি করে : "আরে না। মোটে ত পাঁচ কাণি ক্ষেত দিয়ে গেলেন কর্ত্তা, তাতে কি হয় না হয় আমি কি জান্তুম!"

"তোমার কোন্ ফসলটায় দাঁত বসিয়েছে, বংশী?"

"কেন, তোমার উপর!" ভরত গোঁফের নীচে একটু-একটু হাসে।

"যাও বুড়ো বয়েসে আর মস্করা করতে হবে না!" সুবর্ণও একটু হাসে, শরীরটাকে দুলিয়ে অন্যদিকে চলে যায়।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত অন্যদিকে চোখ ফেরাবে সাধ্য কি! ভরত ওম্নি চেঁচিয়ে ওঠে : "ছ্যাখো ছ্যাখো—তোমার ছেলে খুঁটে খুঁটে খড়কুটো সব মুখে পুরছে!"

ফিরে এসে বংশীকে কাঁখে তুলে নিয়ে সুবর্ণ বলে : "বাপ আদর করে খেতে দিচ্ছে, খাবে না ?"

"ও ভাত খেতে শিখবে খুব শীগ্‌গীর !"

"সে ভয়েই ত মরে যাচ্ছ !" আঁচল দিয়ে সুবর্ণ বংশীর মুখটা মুছিয়ে আনে।

"কি যে বলে ! ও ত আমার বাবা, কপালটা আর নাকটা দেখেছ—ঠিক বাবার মত দেখতে।"

"হবে। গায়ে খেটে ত একদিনও খাওয়াও নি বুড়োকে। খেয়ে এখন উসুল করতে এসেছে !"

ঝুঁকে-ঝুঁকে ভরত হাসতে থাকে। সারাদিন পরিশ্রমের পর হাসিটা ভালোই লাগে নিজের কাছে। মনে হয় হাসতে পারাটা তার পরিশ্রমের পুরস্কার। সুবর্ণের শরীরটাও ফিরে এসেছে আবার—হাস্‌লে আবার গালে তেম্‌নি টোল পড়ে, পালিশ আর নরম দেখায় গলার চারদিককার মাংস। বংশী হবার পর যা হাড়গিলে হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণের শরীর। ভরতের ভয়ই করত কখন হাঁ করে বসে ! মাদুলী, জলপড়া কত কিছুই করা গেছে কিন্তু কিছুতেই কিছুনা, তারপর বিহারী চক্রবর্ত্তীর তিন সপ্তাহের বড়িতে শরীর ফিরতে সুরু করে। বিহারীকে মনে মনে প্রণাম জানায় ভরত। কি বিপদ থেকে যে বাঁচিয়ে এনেছেন তিনি ! আর এখনও কৃতজ্ঞতা জানায় ভরত শীতল মহাপুরুতের মেয়ে টুনীকে। তেরো বছরের মেয়ে, কিন্তু কি মায়া, আর জানে বা কত ! টুনী না থাক্‌লে বংশী বাঁচত না—একেকদিন বেহুঁশ হয়ে থাকত যখন সুবর্ণ, ভরতও ক্ষেতে চারা লাগানো কামাই

দিতে পারে না, তখন বংশীকে খাওয়ানো ধোওয়ানো শোওয়ানো সবই একা ওই মেয়েটা করে গেছে। ভালো হয়ে সুবর্ণ অবশ্যি একটা সিধে পাঠিয়ে দিয়েছে টুনীকে—কিন্তু সে যা করেছে ওই সিধেতে তার দাম আর কতটুকু দেওয়া যায়!

খড় কাটা প্রায় শেষ হয়ে এল—একটু ঘুরে এসেই সুবর্ণ বলে: "কাপড়ের দশা দেখেছ—তাঁতি বাড়ি যাবে ত আজ!"

"বাজার থেকে কলের কাপড়ই কিনে আনি এবার—রাজচন্দ্র সার মস্ত গদী বসেছে বাজারে—রকমারি কাপড়!"

"বা রে, অযোধ্যার মেয়ে বুচি আড়াই সের ধান নিয়ে গেল যে বায়না!"

"কোথায়, জাঙ্গালে ত অযোধ্যাকে নাল ছড়াতে দেখলুম না—ওর বাড়িতে তাঁতের আওয়াজও বন্ধ!"

"তা একজোড়া ত একসঙ্গে নাবাবে—আমার ত শুধু একটা, আরেকটা ফরমাস না পেলে হয়ত তুলবে না।"

হতেও পারে। ভরত একটু বিমর্ষ হয়ে যায়। আড়াই সের ধানের জন্যে নয়। অযোধ্যার কথা ভেবে। কালিগঞ্জের বাজার থেকে সুতো কিনে এনে কাপড় বুনে ক'টা পয়সা বা তার মজুরী থাকে? বর্গা নিয়েছে দু'কাণি ক্ষেত। তাতেও কুলোয় না। হাওলাত-বরাতে তল হয়ে যাচ্ছে। মনটা কেমন অস্থির-অস্থির করে ওঠে ভরতের। অবশ্যি তার চেয়ে দশ বছরের বড় অযোধ্যা কিন্তু মনে হয় ষাট পেরিয়ে গেছে—চুল আর একটিও কালো নেই। ছোটবেলায় দেখেছে ভরত, দক্ষযজ্ঞে অযোধ্যা সতীর পার্ট করত। সুন্দর টুকটুকে চেহারা

আর কি মিষ্টি গলা! পালার পরদিন অযোধ্যাকে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি লোকালুকি লেগে যেত—বৌ-ঝিরাও ঘোমটা তুলে কৌতূহলে ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে একটু হাসত। 'গানটা একটু গেয়ে যা অযোধ্যা—' চারদিক থেকে কেবল এই অনুরোধ। অযোধ্যা কারু অনুরোধই ঠেল্‌ত না। বিশ-পঁচিশটা বাড়িতে বসে তাকে সুর ধরতে হত—"পিতে গো পতি-নিন্দা সহে না কানে—"

একটা সাঁকোর গোড়ায় এসে বোচনের বাড়ির গোবাট শেষ হয়ে গেছে। সাঁকো পার হয়ে বাজারের চওড়া রাস্তায় গিয়ে পড়ল ভরত। তখনও তার মনে লেগে আছে গানের সেই পুরোনো সুরটা—"পিতে গো পতি-নিন্দা সহে না কানে—"।

বাজারে পৌঁছেই ভরত দেখে এক মহামারি কাণ্ড! রাজচন্দ্র সা-র গদির সামনে দাঁড়িয়ে অযোধ্যা পাগলের মত যা-তা বলে চেঁচাচ্ছে—তাকে ঘিরে একটা মস্ত ভীড়। গদীর সরকার রমেশ কুড়ি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাতে একটা খরম উঁচিয়ে বাঁদরের মত মুখ খিঁচোচ্ছে।

ভীড়কে ব্যাপারটা বোঝাবার চেয়ে অযোধ্যা রমেশকেই গালাগালি করছিল বেশি: "তোর বাপের শ্রাদ্ধে লাগবে আড়াইটে টাকা—ভালো করে পিণ্ডি তৈরী করিস্—খয়রাত দিয়ে দিলুম শালা—নিয়ে যা। শালা বলে কি, আমি মিছে বলছি! পাঁচ হাট আমাকে ঘুরিয়ে আজ বলে কিনা এক পয়সাও নেই! বলে কি না মামলা করে আদায় করতে! আড়াই টাকা আদায় করতে মামলা লাগে না সুমুদ্দি—কব্জির জোরেই করা যায়।"

ওদিকে রমেশও নীরব ছিল না। বেতের ডগার মত খড়মটা

লিকলিকিয়ে সেও কথার তুবড়ি ছেড়ে চলছিল: "লাটের বাচ্চার কথা শোনো। রাজচন্দ্র সা-কে খয়রাতি দেখাচ্ছে, ওর মত একশো নফর যার দুয়োরে ধর্ণা দেয়! গাঁয়ে বিক্রী করতে পারে না, বেইমান, এক চিল্‌তে কাপড়, আমরা ষ্টক করে সহরে পাঠিয়ে বিক্রী দিয়ে আনি—তবু দুটো পয়সা পেয়ে বাঁচে আর শোনো সবাই; তোমরা ওর কথা!"

"তোর রাজচন্দ্র বাপকে বলিস শালা, তাঁতিদের তাঁত বন্ধ করেছে কলের কাপড়ের দোকান চটকিয়ে—আবার যদি তাদের পাওনা চুরি করে তবে বংশে কেউ থাকবে না সেই টাকা গিলবার জন্যে! বলিস গিয়ে তোর গোষ্ঠীর বাপকে—অযোধ্যা বলেছে এ-কথা। দেখ্‌ব তোর বাপ কি করতে পারে আমাকে!"

দ্বারিকা আচার্য্য আর তারিণী তহশীলদার এক রকম জোর করেই অযোধ্যাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ভীড় করে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কেউ কেউ হাসল, সে-হাসি যারা চুপ করে ছিল তাদের মুখের চেয়েও দেখতে করুণ। রণ জয় করে গদীতে উঠে গিয়ে খাতাপত্র নিয়ে বসল রমেশ।

ভরত চুপি চুপি এগিয়ে এল গদীর সামনে। কলের ছোপানো শাড়ী ঝুলছে লাল, নীল বেগনি, হলুদ, ফিরোজা, বাদামী। সবই খুব ভালো, দাম নয় বেশি। কচি কলাপাতা রং-এর লালপেড়ে শাড়ীটাই সুবর্ণের গায়ে ঠিক মানাবে। ট্যাঁকে টাকা-টা হাতড়িয়ে দেখে নিলে ভরত।

"কাপড় কিন্‌বি না কি রে ভরত!" বোচন মাঝি এসে পাশে দাঁড়ায়।

কেমন একটু চম্‌কে ওঠে ভরত, বলে: "নাঃ। তুই সওদা করে এলি?"

'হুঁ—দেড় পয়সার তেল আর আধ পয়সার নুন। বাড়ি যাবি না? চল্‌।

"চল্‌।" দু-পা এগোয় ভরত বোচনের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ থেমে বলে—"এক পয়সার নুন আমিও কিনে আন্‌ছি, দাঁড়া। বাজারে যখন এলামই।"

নুনটা শুধু সুবর্ণকে দেখাবার জন্তে যে ভরত সত্যি বাজারে গিয়েছিল। সুবর্ণের এখনও কেমন একটা ধারণা যে ভরতের উড়ো-উড়ো স্বভাব যায়নি। ধারণাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কয়েক দিন হয়ত সমানে দুরন্ত পরিশ্রম করে যায় ভরত—আবার কদিন হয়ত ঘুরে ফিরে গল্পগুজব করেই কাটায়। তখন বাড়িতে কি নেই, কি দরকার সে খোঁজ নেবারও ইচ্ছা থাকে না তার।

"বাজারে গিয়েছিলুম—কিন্তু শাড়ীটা আনা হল না।" একটু সঙ্কোচ নিয়েই ভরত বলে।

"আজই আন্‌তে হবে আমি বলেছি না কি?" বাজারে যাওয়া নিয়ে একটুও সন্দেহ নেই সুবর্ণের।

"না-ও, নুনটা ধর।" আতি-বাঁধা পুটলীটা ভরত সুবর্ণের হাতে এগিয়ে দেয়।

"ওমা, নুনত অনেক আছে—আবার আজই আনতে গেলে কেন?"

"ফেলা যাবে না ত!" ভরত একটু থেমে আবার বল্‌তে থাকে: "শাড়ীটা আনলুম না—একটা শাড়ী খুব পছন্দের ছিল।"

"বেশি দাম বুঝি ?"

"না, ভেবে দেখলুম অযোধ্যার কাছ থেকে নেওয়াই ভালো।"

"তুমিইত বললে ওর তাঁত বন্ধ।"

"ও আর ক'দিন? কালই হয়ত টানা ছড়াবে। না হয় তাগাদা দিয়ে আসব কাল!"

বংশী চেঁচাতে সুরু করেছে। ছেলেটা যদি একদণ্ড নাগাড়ে ঘুমোত! সারাদিন জেগে থেকে টই-টই করা চাই। সুবর্ণ ওকে আনতে চলে যায়।

বাড়ি আসবার পথে ভরত বুচির পাঁচ বছরের ভাইটাকে দেখে এসেছে। কোমরের তাগায় জড়িয়ে একটা নেংটি পরা।

তিল আর মটর তোলা শেষ হয়ে গেছে। ফাল্গুনের শেষাশেষি ওরা একটা বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিল। বৃষ্টি হয়ে গেলে ভালো, নইলে মাটিটা আলগা করবার মতো জল খাল থেকেই বয়ে আনতে হবে। দেরি সয়না বলে ভরত শুকনো মাটিই চষতে গিয়েছিল, কিন্তু লাঙ্গলের ফাল ফিরে আসে। বৃষ্টি না হলেও রোজ একবার করে সবাই ক্ষেতে যায়—ভরত, রসিক, রাইচরণ, ছিদ্দিক। ক্ষেত শেষ হয়ে গাঁয়ের বস্তি যেখান থেকে সুরু সেখানেই ছিদ্দিকের বাড়ি। মাঁদার গাছের বেড়া চারিদিকের আব্রু দিয়েছে, সূর্য্যকে খানিকটা আড়াল করে একটা বিরাট অশথগাছ। তার আদ্ধেকটা অবশ্য ক্ষেতের উপরই ঝুঁকে আছে।

অশথগাছের নীচেই জটলা হয় খানিকক্ষণ। তামাকটা ছিদ্দিকের বাড়ি থেকেই আসে। ঝিমিয়ে কথা চলে। সিরাজের কথা ওঠে। বেচারী গাঁ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল!

"ওর চাচাত ভাইরা ওকে ঠকিয়েছে! আসগর মিঞা লোক ভালো ছিল—ছেলেদের সমান সমান করে সিরাজকেও ক্ষেত দিয়ে গেল। কিন্তু মুখের কথা ত—কে শোনে—পাট্টা কবালা নেই যে!"

"আরেকটা কথা তুই দেখেছিসনে ছিদ্দিক," রসিক বলে: "গান-বাদ্যি নিয়ে বাজারেই পড়ে থাকত না সিরাজ—ক'দিন ক্ষেতে এসেছে? চাচাত ভাইদের দোষ দিলেই ত হয় না—স্বভাব ওর খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

যা-ই হোক সিরাজের জন্য ভরতেরও কেমন একটু ব্যথা লাগে। চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে: "বিষ্টি এবার শীগগীর হচ্ছে না রে ছিদ্দিক! মেঘের একটা ফোঁটাও দেখা যায় না।"

পিঠের দাদে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে ছিদ্দিক একটু হাসে: "হাঁ করে আছিস কি না এবার সবাই পাট করবি, তাই মেঘ বাদ সাধছে!"

"সেবারে আমরা করলুম ধান আর তুই করলি পাট," রসিক বিষণ্ণ হয়ে বলতে থাকে: "আর তোর এমনি বরাত, আঠার টাকা মণ পেয়ে গেলি।

"এবার দেখো কুড়ি টাকা দর হবে—" প্রায় লাফিয়ে ওঠে বলে রাইচরণ।

"হতে পারে।" ছিদ্দিক ভবিষ্যতের কি জানে!

"এখন থেকেই ব্যাপারীরা খোঁজ করছে নাকি কে কে পাট করবে!" আশার আলোতে ফর্সা হয়ে ওঠে রাইচরণের মুখ।

"কিন্তু বিষ্টি কোথায়?" ভরতকে একটু অস্থির দেখায়।

"বীজ ছড়াতে পারলেই কিন্তু এবার কালী বাড়ি যেতে হবে ভরত—" রসিক ভরতকে মনে করিয়ে দেয়—"যাব-যাব করে যাওয়া আর হচ্ছে না। এক টাল মানত পড়ে আছে!"

"দেবতার কোপে কি হয় বলা ত যায় না।" রাইচরণ দাদার সঙ্গেই আছে!

"কালী বাড়ি? সেই পাহাড়ে?" ভরত জিজ্ঞাসা করে।

"পাহাড়ে না ত কোথায়—সাক্ষাৎ দেবী!"

"বউকে ছেড়ে যেতে মন চায় না বুঝি রে ভরত—" ছিদ্দিক মস্করা করে।

সত্যি অনেকটা তাই। ভরত একটু বে-দিশা হয়ে যায়।

"না রে ভরত, দেবতার সঙ্গে ছলচক্করি করতে নেই।" রসিক সাবধান করে দেয়।

ভরত ত কোনোদিন তা করে না। তাছাড়া সুবর্ণ তাকে একটু নড়চড় হতে দিলে ত! নাটঘর শিববাড়ি থেকে মাদুলী এনে ঝুলিয়েছে ছেলের গলায়। দেবতার সুদৃষ্টি না থাকলে কি মানুষ বাঁচতে পারে? মনসার মূর্ত্তি তৈরী করতে গিয়ে শেষ করল না বলেই না সে বছর তার বাবা মারা গেল। দেবতার নামে বুক দুড়দুড় করতে থাকে ভরতের।

"জমিদারের কি হাল হয়েছে দ্যাখ!" রসিক কল্কেতে রাইচরণের প্রত্যেকটি ফুঁ লক্ষ্য করে বল্‌তে সুরু করে: "যজ্ঞেশ্বরঠাকুর বলেছিলেন

ছোটবাবু এবার বাসন্তী পূজো বারণ করে দিয়েছেন—বলেন দুবার করে দুগ্‌গোচ্ছবের কি দরকার! সহরে থেকে সায়েব হয়ে এসেছেন—আর তার আক্কেলটাও ঢ্যাখ! দুদুটো মহাল—সোনার মহাল—নিলেমে হাতছাড়া হল। রায়পুর তালুক যায় কেন?—বড়কত্তা বেঁচে থাকতে ঝর্ঝর করে টাকা আসত না?"

"বড়কত্তা ছিলেন সাঁচ্চা বামুন—কি দরাজ দিল! চোখে পড়লে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করা চাই—ছিদ্দিক কেমন আছিস্‌!"

"শঙ্কর রায়ের দেখা পাবি এখন? বাড়ির ভেতর বসে কি যে করে অষ্ট'পর! নেশা-টেশা করে হয়ত।"

"আরেকটা খবর জানো না দাদা—"—হুঁকোর সঙ্গে রাইচরণ খবরটা নিবেদন করে: "বুড়ো কত্তা ত মকুবপুরের চৌধুরীদের মেয়ে দেখে শুনে রাখলেন, ছেলে বিয়ে দিয়ে জুড়ি জমিদারকে কুটুম করবেন—ছোট কত্তা বুড়ো বেঁচে থাকতে তাই বিয়েই করল না। এখন সহর থেকে কোন উকিলের মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে!"

বিয়েতে ডাক পড়েছিল ভরতের। দোতলার বারান্দায় এক ঝিলিক দেখতেও পেয়েছিল সে নতুন বৌ-কে। চমৎকার চেহারা—আর কি অদ্ভুত সুন্দর সাজপোষাক। অলঙ্কার ছাড়াও মেয়েদের এমন আশ্চর্য্য দেখাতে পারে? ভরত অবাক হয়ে যায়, এত ভালোমানুষ শঙ্কর—তাকে নিয়ে এরা কি সব বলে যাচ্ছে! মনে করে একবার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু এদের তোড়ের মুখে বাধা দেবার সাহস হয় না। হয়ত গাঁশুদ্ধু লোক শঙ্কর রায়কে অভিশাপ করে—সে যদি একা তাকে ভালো বলতে যায় তার শরীরে জমিদার বাড়ির নূনটাই

সবার চোখে পড়বে, শঙ্কর রায় ভালো হয়ে উঠবে না। ধোপা নাপিত চামার আচায্যি পুরুত সবাই ভরতকে তেড়ে আসবে। তারা খেতে পায় না। তাদের খেতে দিতেন যিনি সেই শিবরাম রায় বেঁচে নেই।

সন্ধ্যা লাগলে তবে আড্ডা ভাঙ্গে। অনেকটা পথ একা ফিরতে হয় ভরতের। তখন আর কিছুই মনে পড়ে না, তার সুবর্ণকে ছাড়া। সত্যি সুবর্ণের আশা কিছু-কিছু মেটাতে পেরেছে সে। দুজনের খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ধান-চাল নাড়াচাড়া করতে পারে সুবর্ণ—একটা ছোট পেতলের ঘটিতে কয়েকটা টাকাও পুঁতে রাখতে পেরেছে, বাজারের কেনা নারিকেল তেলও মাথায় দিতে পারে, আশা করে পাটটা উঠে গেলেই বংশীর জন্যে রূপোর থাড়ু আর বালা হয়ে যাবে।

অযোধ্যার বাড়ির কাছে এসেই মনে পড়ে ভরতের আজও কাপড়টা দিলে না অযোধ্যা। অযোধ্যাকে ডাকতে ডাকতে বরাবর ঢুকে পড়ল সে বাড়ির ভেতর। চতুর্থীর চাঁদের খানিকটা জ্যোৎস্না আছে—তার আলোতেই বাঁশঝাড়ের, বাতাবি আর বেলগাছের চাপ-চাপ ছায়া দেখা যায়।

তাঁতের ঘরটা অন্ধকার, দরজা ভেজানো। যে ঘরটায় আধাআধি শোবার রান্নার ব্যবস্থা তার দাওয়ায় টিমটিম করে একটা কুপি জ্বলছে।

উঠোনে দাঁড়িয়েও একবার ডেকে নেয় ভরত: "অযোধ্যাদা—"

"ভরত? চলে আয় ভাই, ঘরের ভেতর!"

ঘরে ঢুকে ভরত দেখ্‌তে পায় একটা জলচৌকিতে বসে অযোধ্যা কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে সামাল দিচ্ছে। কাছেই এতক্ষণ বসেছিল তার বউ। ভরতকে দেখেই সরু-সরু পায়ে দৌড়ে সে আড়ালে চলে গেল।

"বড্ড গরম অযোধ্যাদা, ঘরের ভিতর কি করে বসে আছ?" ভরত বেরিয়ে এসে দাওয়ার উপরই লেপ্‌টে বসে পড়ে।

অযোধ্যা কিন্তু ভেতরেই সিকিম হয়ে আছে।

"কাপড়টার কি করলে অযোধ্যাদা—"

"আর তিন ঘণ্টার খাটুনি ভাই—কালই নামিয়ে দিচ্ছি, শরীরটা জুত লাগছিল না আজ—নইলে অ্যাতক্ষণে নেবে যেত।" কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা মুখে অযোধ্যা বিগলিত হয়ে হাস্‌তে চায়। কি কুৎসিত যে দেখায় হাসিটা—ভরত মুখ ফিরিয়ে না নিয়ে পারে না। কেমন যেন হয়ে গেছে অযোধ্যা আজকাল, অভাব যতই বাড়ছে ততই যেন কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে সে। কি করে এমন নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে? দড়ির মত হাত পা বাচ্চাগুলোর, শুকিয়ে কাঠমত হয়ে গেছে বউটা, গা-ময় কেঁচোর মত রগগুলো ফুলে আছে। বুচিটা বড়সড় হয়ে উঠেছে, আটহাতি কাপড়ে ওর শরীর কুলোয় না। কোনোদিকেই যেন অযোধ্যার চোখ নেই। তাঁত ছেড়ে দিয়ে না হয় ক্ষেত-খামারই কর, এখনও চেষ্টা করলে দু'চার কাণি বর্গা পাওয়া যায়। তাই নিয়ে অন্তত দুবেলা দুমুঠো ভাত দে ওদের মুখে! কিন্তু তা সে করবে না। দেবতার কোন্‌ বিষম অভিশাপের মুখে যেন সে গা ছেড়ে দিয়েছে। কেন এমন হয়? শরীরে শক্তি আছে যাদের কেন তারা যেচে কষ্ট পায়? ভরত বুঝতে পারে না।

তাঁতঘরের দরজাটা নড়ে উঠ্‌ল—মুখ তুলে ভরত চাইল সেদিকে। উদোম গা—বাবরী চুল একটা ছায়ামূর্ত্তি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ভরত হেঁকে উঠ্‌ল: "কে রে?" ছায়ামূর্ত্তি ফিরে চাইবার দরকার বোধ করলে না। হন হন করে গোবাট ধরে অন্ধকারে মিশে গেল। ভরত অস্থির হয়ে বল্‌লে: "অযোধ্যাদা তোমার তাঁতঘর থেকে কে বেরিয়ে গেল—দেখ্‌লে?"

জলচৌকিতে স্থির হয়ে বসে থেকেই অযোধ্যা কেমন শুক্‌নো গলায় বললে: "তাই না কি?"

ভরত অবাক হয়ে গেল, অযোধ্যার চোরের পরোয়াও নেই! হতে ত পারে দু'বাণ্ডিল সুতো নিয়েই পালিয়ে গেল লোকটা। সুতো-বোঝাই মাকুগুলোও ত নিয়ে যেতে পারে! কোথায় হাঁ-হাঁ করে ছুটে বেরিয়ে আস্‌বে অযোধ্যা না কি গণেশঠাকুরের মত দিব্যি বসে আছে।

তাঁত ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে আছে। কুপিটা নিয়ে এগিয়ে যাবে না কি ভরত ভাব্‌ছিল। ঘরের মধ্যের অন্ধকারের অস্পষ্টতায় দেখা গেল আরেকটা মানুষের ছায়া—মেয়েমানুষের ছায়া—কাপড়টা টেনে টুনে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল—নেমে এলো উঠোনে—তারপর রান্নাঘরের খাটো দরজার আড়ালে চলে গেল। স্পষ্টই দেখ্‌তে পেল ভরত ওটা আটহাতি কাপড়ে বুচির ছায়া।

মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌ল ভরতের। নিজকে কোনো-রকমে গুছিয়ে তুলে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে গেল ভরত: "কাল কিন্তু

দিও কাপড়টা অযোধ্যাদা—" এক মুহূর্ত্তও ভরত আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না!

অযোধ্যার ঘরের ছন্‌চাটা পার হবার আগেই শুনতে পেল ভরত, চাপা গলায় বুচি তার মাকে ডাক্‌ছে: "মা—দরজাটা খোল।"

বাড়ি এসেও ছটফটানি গেল না ভরতের। সুবর্ণ বল্‌লে: "জমিদার বাড়ি থেকে খবর দিয়ে গেছে—কাল সকালেই যেন যাও।" ভরতের কানে কিছু গেল কি না বোঝা গেল না। ভাতও খেল সে অন্যমনস্ক হয়ে। তারপর একটি কথাও না বলে মাচার উপর গা এলিয়ে দিল। ঘুম আনবার আগ পর্য্যন্ত ভাব্‌ছিল ভরত, অযোধ্যাই সতীর পার্ট করত!

আকাশ ফর্সা হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মনও ফর্সা হয়ে যায়। ভরত উঠে দেখল বংশীকে খোয়াড়ে রেখে ঘরদোর লেপতে সুরু করে দিয়েছে সুবর্ণ। চোখে একটু জলের ঝাপটা দিয়েই ভরত গোয়ালের খবর-দারিতে গেল। দুধটা দুইয়ে রেখে তবে বাবুর বাড়ি যেতে হবে। কিন্তু বাবু ত তলব করেন নি। সুবর্ণ বল্‌ছিল কাছারীর লোক খবর দিয়ে গেল। কাছারীর সঙ্গে ভরতের কি সম্বন্ধ? টিমটিম করছে আজকাল কাছারী—পাইক প্যাদা নেই বললেই হয়—কে এক মুহুরী আছে ভরত তাকে চেনে না। চেনে শুধু তারিণীঠাকুরকে। তারিণীঠাকুর! বাবরী চুল! কালকের সন্ধ্যাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভরতের।

কাছারীর বারান্দায় উঠে দোরগোড়ায় আস্তে আস্তে বসে পড়ল ভরত। ময়লা ফরাসের উপর তারিণী চক্রবর্ত্তী একটা ফতুয়া গায়ে বসে আছে—দাঁড়ি গোঁফ চেঁছে আর বাবরী রেখে বয়েসটা কমাতে চাইলেও মুখের চামড়া থেকে চল্লিশ বছর বয়েসের রুক্ষ রেখা মুছে যায়নি। একটা চিরকুটে বার দশেক দুর্গা নাম লিখে এইমাত্র তারিণী দাখিলার বই-এ হাত দিয়েছে। তরফ শশীদল মোতালক ২২নং লাট দক্ষিণ চকের ওয়াশীলের বিবরণে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল তারিণী এমি মনোযোগে যেন ইষ্টমন্ত্র জপ করছে। কিস্তির হাল-বকেয়া হিসেব, খেলাপী সুদের পরিমাণ, মোট ওয়াশীলের মবলগবন্দী—পাইপয়সাটিও তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। অন্তত শঙ্কর রায় তা-ই জানে। সেরেস্তায় যতক্ষণ বসে থাকে কাগজপত্র থেকে মাথা তুলতে তাকে কেউ দেখেনি। তবে ভরতের মত যাদের তলব করে আনা হয়, তারা এলে ভুরুর নীচ দিয়ে ছোট ছোট চোখের চোখা দৃষ্টি নিয়ে তারিণী বার কতক তাদের বিঁধতে চেষ্টা করে।

"ভরত এসেছিস্?"

"হেঁ কর্ত্তা—"

"দক্ষিণ চকের পাঁচকাণি ত স্বর্গীয় কত্তা তোকে দিয়ে গেছেন—নিষ্কর?"

"আজ্ঞে—"

"চৌহদ্দিটা বলতে পারিস—"

"আজ্ঞে ছিদ্দিকের জমির লাগ উত্তরে—"

"বুঝেছি-বুঝেছি আর বলতে হবে না।" তারিণী এবার মুখ

তোলে। দাখিলা-পত্তনী বইগুলো বন্ধ করে ভরতের দিকে পুরোপুরি তাকায়।

"ছাখ ভরত—মহালের অবস্থা ত তোদের সবই জানা। তোরা তবু খেয়ে-পরে আছিস কোনোরকমে কিন্তু জমিদারের অবস্থা বেহাল। তোরাও নে—কত্তাকেও দে কিছু।"

"আজ্ঞে আমার দু'পয়সা নিয়ে ছোটকত্তার কি হবে—অথচ দু'পয়সায় আমার দুটো দিন চলে যায়। বড়কত্তা আমায় ওম্নি দিয়ে গেছেন জমি।"

একটু বিরক্ত হয়েই তারিণী বলে: "তোরা এম্নি যে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেও কিছু বুঝ্তে চাইবি নে! বড়কত্তা দিয়ে গেছেন! দিয়ে গেছেন যে কবালা আছে?"

"কবালার আমার দরকার কি কত্তা—বড়কত্তার মুখের কথাই ত দেবতার বাক্যি—"

"হয়েছে-হয়েছে। যা দেখা যাবে!" ব্যস্ত হাতে খাতাপত্র টেনে নিয়ে তারিণী আবার হিসেব-নিকেশে মন দিলে। গরুর মত টলটলে চোখে কতক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে ভরত উঠে পড়ল। কিন্তু কাছারী বাড়ির উঠোনে পা বাড়িয়েই বাবার একটা কথা মনে পড়ছিল তার: 'তুই জয়মালের ছেলে না?' ভরত নিজের কব্জিতে, আর বুকের ছাতিতে চোখ বুলিয়ে নিলে একবার। হাঁ—জোর আছে তার গায়ে, জয়মালের জোর না থাক্লেও তারিণীর ঘাড়টা ভেঙে দেবার মত জোর আছে। কিন্তু তা থেকেও লাভ কি হল তার! উঁচু গলায় একটা কথা বলবার সাহসও ত হলনা! নিজের উপর নিজেই রেগে

উঠ্‌ল ভরত। সদর দালানের বারান্দায় গিয়ে ডাক্‌ল সে: "কত্তা—"

পাশের একটা কামরায় শঙ্কর বসে বসে দৈনিক কাগজ উল্টোচ্ছিল। পরণে দিশী মিলের একটা ধুতি—আর খদ্দরের একটা খাটো ফতুয়া গায়ে। উস্কোখুস্কো চুল—ছেলেবেলাকার ফুটফুটে রং কালসে হয়ে গেছে। মুখ তুলে চেয়েই শঙ্কর বল্‌লে: "ভরত? চলে আয়—এখেনেই।" নালিশের ঝোঁকটা পাছে নষ্ট হয়ে যায় ভরত আর শঙ্করের কথাটাকে পড়তে দিলে না: "আমায় না কি খাজনা দিতে হবে কত্তা—"

ছোট্ট একটু হাসি ঠোঁটে এনে শঙ্কর বল্‌লে: "দিবি নে? না দিলে আমি খাবো কি?"

"বড়কত্তা ত আমায় ওম্নি ওই জমিটুকু দিয়ে গেছেন কত্তা—"

"আমাকেও ত অনেক জমিই দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা—কিন্তু আজ কি তা আমার আছে?"

হয়ত নেই। ছিদ্দিকের কাছে শুনেছে ভরত খাস খামারে এক তিল জমি নেই জমিদারের অথচ এ গাঁয়ের উপরেই রাজচন্দ্র সা-র দুই দ্রোণ জমি। রসিক ত বলে মহালই ক'টা যেন নিলেমে চড়ে গেছে। কেন এ দশা জমিদারের? জমিদাররা সম্পত্তি উড়িয়ে দেয়, মদ খায়, বাই নাচ করায়—শুনেছে ভরত। কিন্তু শিবরাম রায়কে এ দোষ ত শত্রুতেও দেয় না। ছোটকর্ত্তা ত বাড়ি থেকে বেরুনই না—এত টাকা কোথায় যায় তবে?

"আমার ক'টা পয়সাতে আপনার কতটুকু হবে?"

"তোদের কাছ থেকে একটা দুটো পয়সা চেয়ে নিয়েইত আমার খাওয়া—নইলে আমায় কে দেবে বল্! নিজেও খাব সরকারকেও দোব—এই ত আমার কাজ। আসলে আমরা ভিখিরি ভরত, এ যা ঠাট দেখছিস—সব অনর্থক!"

দেশের রাজা, এত লোকের আশ্রয় জমিদার কি এ সব বলে! ভরতের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। অজ্ঞাতেই সে জিভ কেটে ফেলে—এ সব কথা শুনে যেন সে পাপের ভাগী হচ্ছে।

"তোর কাছে আমি খাজনা চাইনে—বাবা দিয়ে গেছেন জয়াদার কাজের জন্য তোকে এ জমি, তাতে আমার কিছু অধিকার নেই—বলছিলুম ওম্নি।" একটু থেমে থেকে শঙ্কর আবার বলতে সুরু করলে: "প্রজারা যদি খাজনা না দেয় ভরত, তাদের কাছ থেকে জোর করে আমি আদায় করতে পারিনে! দিতে পারে না বলেই ত দেয় না! বন্যায় ফসল মরে যায়, অনাবৃষ্টিতে ফসল হয় না—তার সঙ্গে ত আমাদের যুদ্ধ চলে না—যুদ্ধ করি আমরা পাইকপ্যাদা পাঠিয়ে প্রজাদের সঙ্গে। কতটুকুই বা তারা ফসল তোলে বছরে—তাতে যদি আবার এক বছর ফসল মারা যায়, তার ক্ষতিপূরণ জীবনে আর হয় না। খাজনা বকেয়া পড়লে তা বাড়তেই থাকে, উসুল হয়ে আসে না কোনদিন। কিন্তু আমার খাজনা বকেয়া পড়লে মহাল নিলেমে চড়ে। অনেক সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে, ভরত, শশীদলের রায় বাড়িতে।" শঙ্কর জোরে হেসে ওঠে—ফাঁকা, ফাঁপা হাসি। তাতে চমকে উঠবার কথা। ভরত চম্‌কে ওঠে। হাসিটাই ঠিক বুঝ্‌তে পারে সে—কথাগুলো সব বুঝতে পারে না।

হাসিটা বুঝলেও নিজের কথাটা ভোলে না ভরত: "তারিণীঠাকুর বল্‌ছিলেন আমার জমিতে না কি খাজনা বসাবেন!"

"আমার অবস্থাটা জানে বলেই হয়ত এ নতুন মতলব করছিল। তোকে খাজনা দিতে হবে না—বলে দোব আমি তারিণীবাবুকে।"

কপালে দুশ্চিন্তার কোঁচাগুলো সমান হয়ে এল ভরতের। এতক্ষণে যোড় হাত দুটো আলগা করে শঙ্করের পা ছুঁয়ে ফেল্‌ল সে।

বোজা দিঘীর পারে ভাঙ্গা মঠটার দিকে চোখ রেখেই শঙ্কর বললে: "বামুন হয়ে জন্মেছি—তার উপর জমিদার—প্রণাম পেতে আর হাঙ্গামা নেই!"

এবার উঠ্‌বে ভাবছিল ভরত। সদর উঠোনে ছোটখাট একটা ভীড়ের সঙ্গে গোলমাল দেখা গেল। বারান্দায় গিয়ে শঙ্কর পেছনে ভরতকে জিজ্ঞেস করল: "ব্যাপার কি রে?"

ততক্ষণে ব্যাপারটা বলবার জন্তে ভীড়ই দালানের কাছে এগিয়ে এসেছে। ভীড়ে আছে শীতল মহাপুরুত, বজ্রমুষ্টিতে নগরবাসী চামারের হাতের কব্জিটা ধরা। আরসোলার মত হিড়্‌হিড় করে শীতলের টানে চলে আস্‌ছিল নগরবাসী। সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাত-পা নেড়ে আর মুখে খই ফুটিয়ে চলেছে দ্বারিকা আচার্য্য। দু'একজন কৈবর্ত্ত আছে—আর ছোট বড় কতকগুলো ছেলে।

অপরাধীকে চেনা যায়। অপরাধ কি সাব্যস্ত হয় তারি জন্ত প্রতীক্ষা করছিল শঙ্কর।

ব্যাঙের মত হাঁপাতে হাঁপাতে শীতল যা বল্‌লে তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে গাঁয়ের ভেতর চামারদের জায়গা দেওয়া আর হাঁড়িতে এনে

সাপ রাখা সমান কথা। আজ যে নগরবাসী তার গরুগুলোকে বিষ খাওয়াতেই এসেছিল এ নিয়ে কারু সন্দেহের লেশমাত্র নেই এবং তার বিচার স্বর্গীয় কর্ত্তা থাকলে যে কি হত তা-ও শীতল জানে। এই খুনেকে কর্ত্তার কাছে এনে সে পৌঁছে দিল—কর্ত্তা এখন গাঁয়ের লোকের দিকে চাইবেন কি এর দিক দেখবেন তা সম্পূর্ণই কর্ত্তার মর্জ্জি।

এম্নিতেই চামারদের কথা বোঝা যায় না—হাঁউমাউ করে নগরবাসী বল্লে: "ঘরে চাল নেই—উপোস করে আছি কর্ত্তা—" জিভ বার করে পেটে দুটো চড় বসিয়ে দিলে নগরবাসী: "ভিখ মাঙতে এসেছিলুম—জ্যান্ত গরু ত দেবতা—আমি মারব কেন? কোথায় আমার কাছে কি আছে দেখুন!"

একটু জিরিয়ে নিয়ে শীতল ধমক দেবার মত দম পেলে: "চুপরও। দ্বারিকদা, তুমি ছ্যাখোনি বেত-আড়ে হারামজাদা কি ফেলে দিলে!"

দ্বারিকা ইতিহাস বল্তে সুরু করলে: "ওর বাপও ওম্নি গরুবাছুর মেরে বেড়াত। তা-ই নিয়ে ত একবার শেখ-পাড়ার সঙ্গে খুনোখুনির উপক্রম! আস্গর লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়াল গিয়ে চামার-হাটিতে—"

দ্বারিকাকে কেটে দিলে শঙ্কর: "আপনারা যা বল্ছেন বিষের ব্যাপারটা ত সত্যি না-ও হতে পারে। হতে পারে ত যে নগরবাসী ভিক্ষে করতেই এসেছিল।"

কপাল কুঁচিয়ে অন্যদিকে চেয়ে শীতল বল্লে: "বল্তে পারেন, কর্ত্তা।"

"না-না আমি বল্ছিনে। এমন মনে করা যায় তা-ই বল্ছি।"

"মনে করা-করি কি কর্ত্তা—স্বচক্ষে দেখলুম!"

"তাই যদি দেখে থাকেন তাহলে আর কি!" শঙ্কর ঠোঁটের কিনারে একটু হাস্‌লে: "দ্যাখ নগরবাসী, তুই আর বাবুদের পাড়ায় আস্‌তে পারবি নে—খবর্দ্দার, দেখছিস ত বাবুরা কেমন রেগে গেছেন! আর দেখুন ঠাকুর, চামারদের ত আমি এনে গাঁয়ে বসাইনি—যিনি এনে বসিয়েছিলেন—আমার ঠাকুর্দ্দা—তিনি এখন স্বর্গে! তাঁর অনুমতি ছাড়া ত এদের উঠিয়ে দেওয়া যায় না।"

শঙ্কর ধীরে ধীরে অন্দরে চলে গেল।

পথে ভরতকে উপলক্ষ করেই বল্‌ছিল দ্বারিকা: "থাকতেন আজকে শিবরাম রায়, নগরবাসীর গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী করে সে জুতো পরে বাড়ি যেতুম। আর তাঁর বাবা রামমাণিক্য রায়কে নিয়ে ত কথাই নেই—বল্‌ছিল শঙ্কর, ঠাকুর্দ্দা স্বগ্‌গে—আরে স্বগ্‌গে থেকে ত রামমাণিক্য রায় তোকে থুতু দিচ্ছেন! বুঝলে শীতল, গাঁয়ে টুঁ অন্যায়টি হবার উপায় ছিল না তখন—কতলোককে মেরে পুঁতে ফেলেছেন—কাছারি বাড়ির নেউ কাটবার সময় কম করে পাঁচটা খুলি পাওয়া গিয়েছিল—এত আমার চোখে দেখা!"

"পাপে ধরেছে,—পাপে ধরেছে, নইলে কি আর সোনার জমিদারির এই অবস্থা! দেখবে কোনদিন সব বিক্রি-ফিক্রি করে সহরে দৌড়ুবে শঙ্কর রায়।"

"পাপ! ও-ত পাপে ডুবে আছে! পূজো-পার্ব্বন ত সব গেছে চুলোয়! এবার বাসন্তী পূজো তুল্‌ল—শুনছি আসছে বছর দুগ্‌গো পূজোও হবে না। না হোক্! আমাদের আর কি! বিশপঁচিশটা

টাকা হ'ত আর মাসেকের খোরাকি—না হয় গেল! উপোস ত আমরা করেই আছি। কিন্তু তোর গতিটা কি হবে! দেবতার কোপ সামলাবি কি করে।"

ভরত চুপ করেই ছিল। বুঝতে পারছিল চুপ করে থাকা তার উচিত নয়। জমিদারের ছোঁওয়া তার সর্ব্বাঙ্গে লেগে আছে, এখন যদি এদের ক্ষ্যাপামিতে সে সাড়া না দেয় তাহলে বিপদ। শীতল আর দ্বারিকার কথায় তাই সে মাথা ঝুঁকুতে সুরু করলে প্রথমে। তারপর 'হুঁ' 'হাঁ'-ও চল্‌ল। শেষটায় জুটেই গেল তাদের সঙ্গে: "বুঝলে শীতলমামা,—কাণাকড়ি ত জমিদারের কাছে পেত্তাশা নেই আবার ফিরে আমাদের মুখের গ্রাস কাড়তে আসেন! ডাকিয়ে এনে বলে কি জানো, বলে—খাজনা দাও—"

শীতল একটা পুরোনো আগুনে নতুন করে তেতে ওঠে: "তবে আর বলি কি? আমার সাড়ে দশগণ্ডা ব্রহ্মোত্তরে খাজনা বসিয়েছে! বলে, জমিদারের ত লাখেরাজ পড়ে নেই যে নিষ্করজমি দান করবে! বছরান্তে বাপপিতাম'ত একবিন্দু জল পায় না, তিল-তর্পণ ত চুলোয় যাক্—আবার উল্টো কি জবরদস্তি দ্যাখ।"

মোটের উপর শঙ্কর রায়কে বিচার করে তুলো-ধুনো করা হল—এবং বিচারের শেষে সবাই একবাক্যে এই রায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হল যে দুয়োরে দুয়োরে হাত পাতবার আর তার বেশি দিন বাকি নেই।

শীতলের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল ভরত—দাওয়ায় উঠে শীতল ডাক্‌লে তাকে: "এক ছিলিম তামাক খাইয়ে যা ভরত—"

"না আর বস্‌ব না মামা, বেলা হয়ে গেল।"

ফুরুৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল টুনী : "বাব্বা—দেমাক কত! বস্‌তে বল্‌লেই কাজ থাকে, না?"

মেয়ের কথায় শীতল আহাম্মুকের মত হাসতে থাকে। ভরত অবাক হয়ে যায়। ভারি চালাক হয়েছে ত টুনী! কিন্তু চালাকিটা খুব খারাপ লাগে না তার।

দানে পাওয়া জ্যালজেলে খাটো একটা কাপড় পরণে টুনীর। মহাপুরুতকে ভালো কাপড় আর কে দেয়! সে-কাপড়ে বন্ধুর শরীরটা কোনোরকমে ঢাকা পড়ে। কিন্তু থোকা-থোকা মাংসের চাপ যেখানে বেশি সেখানে কাপড়ের আব্রু ব্যর্থ। বগলের পাশে বুকের অনেকটা জায়গাই উদোম—একপাশে কাপড়ের পাড়ের চাপ খেয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ফোলা। ওদিকে চেয়ে থেকেই ভরত দাওয়ায় উঠে আসে—যেন ও জায়গাটা তাকে গুণ করেছে।

বেড়ার গায়ে ঝোলানো বাঁশের চোঙ্‌-টা পেড়ে নেয় ভরত—টিকের খুরিটা এগিয়ে আনে—"একটু আগুন দিবি, টুনী?" গলায় কাতরতা এনে টুনীকে অনুরোধ জানায়।

"সকাল বেলায় মুখে আগুন পুরবে? তার আগে গরীবের বাড়িতে দুটো নাড়ুই মুখে দিয়ে নাও।"

শুধু মা-মরা বলেই নয়, ভাত ফুটিয়ে দেবার একমাত্র প্রাণী হিসেবেও টুনীকে অসম্ভব খাতির দেখায় শীতল। ভরতের সঙ্গে টুনীর এই ঠাট্টা-মস্করায় তাই সে কান পাতে না। শীগগির আর ভরত আগুন পাচ্ছে না টুনী যখন বেঁকে বসেছে—শীতল তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলে : "দুধটাই দোয়া হয়নি—বাছুরে হয়ত এতক্ষণে সাবড়ে দিয়েছে!"

"হেঁ—" সুর করে একটা লম্বা টান দেয় টুনী: "তোমার জন্যে দোয়া রেখে দিয়েছি কিনা আমি—"

"দিব্‌রে ত দিস্‌নি গরুগুলোকে—" শীতল আরেকটা কাজ আবিষ্কার করে।

"সে টানা হেঁচড়া তুমি কর়গে যাও—"

শীতল কাপড়টা হাঁটুতক উঠিয়ে পালোয়ানি করতে চলে যায়।

টুনীও বসে ছিল না। বেতের একটা ছোট্ট টুক্‌রিতে খানিকটা খই আর গোটা চারেক নারকেলের নাড়ু এনে হাজির করল ভরতের সামনে, ঘটিতে করে জল গড়িয়ে এনে দিলে।

"খেয়ে নাও, তারপর বসে বসে খুব হুঁকো টেনো—" সাদা চক্‌চকে দাঁতগুলো তামাটে মাড়িতেও সুন্দর দেখায় টুনীর। ভরত কি বল্‌বে দিশা করে উঠ্‌তে পারে না—ভয়ে ভয়েই যেন টুক্‌রিটা টেনে নেয়।

"খাও। জাত যাবে না—এতো আর ভাত নয়!"

দূর্, একি একটা কথা নাকি? ভরত কি জাতের কথা ভাবছে? কায়েত হলেও বা কি—চাষী ছাড়া ত সে কিছু নয়, চাষীর আবার জাত কি? ছিদ্দিকের বাড়িতে সে চিঁড়েও খায় জলও খায়—রসিকের অবশ্য জাতের গুমোর আছে। নমঃশূদ্র মুসলমানের চেয়ে বড়, বলে বেড়ায় সে, কারণ হাজার হোক নমঃশূদ্র হিন্দু ত! ছিদ্দিক কিছু বলে না, মুখটা শুধু তার কালো হয়ে যায়।

"কথা বল্‌বে না বুঝি আমার সঙ্গে?" টুনীর গলাটা কোথায় যেন ভেসে যায়। এমন চট্‌পটে মেয়ের সমস্ত শরীরে যেন একটা ছায়া জমে আসে।

"কথা বল্‌ব কি—খাচ্ছি যে।" ভরত খুসী-খুসী চোখ নিয়ে তাকায় টুনীর দিকে।

"সেই যে কবে বৌঠানের অসুখের সময় এসেছিলে, আর বুঝি আমাদের বাড়ি আসতে নেই!" কালো কালো চোখের একটানা চাউনি ভরতের চামড়া, মাংস ভেদ করে হাড় পর্য্যন্ত চলে যায়। ভরতের কাঁপুনি ধরে। ঠোঁট শুক্‌নো হয়ে আসে, যেন ঠাণ্ডা বাতাস লেগেছে।

"কাজ—কাজ আছে কি না!" তোৎলাতে থাকে ভরত।

ঠোঁটের একটা কোণ দাঁতে চেপে টুনী বলেঃ "ও"—তারপর খুরি থেকে একটা টিকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

শীতল মহাপুরুতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভরত একবার ভাবলে বাজারটা ঘুরে যাবে। কিছু কেনাকাটি করলে মন্দ হয় না। বাজারের পথও ধরে ফেলেছিল সে, কিন্তু হঠাৎ মনে হল, পয়সা কোথায়! সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে, আর বাজার করবে বলেও বেরোয়নি। তবু পথ ধরেছে যখন হাঁটতেই সুরু করল ভরত।

টুনীর কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল। ভালো মেয়ে। আর কোনো স্তুতি তার জানা নেই। জানা থাকলে হয়ত বল্‌তে পারত। মনে মনে 'ভালো মেয়ে' কথাটা বলে ফেলেও সে অন্যমনস্কই রয়ে গেল। গান গাইবার ইচ্ছা করছিল ভরতের—কবি গানে শোনা একটা চরণ সুর করে টান্‌লও সে কতক্ষণঃ "একবার দাঁড়াও হে রাম কমলাখি, নয়ন ভরে তোমায় দেখি, পরমব্রহ্ম রূপেতে।" তারপর নিজেই বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিল গান।

ভরতের কিছুই করবার ছিল না বাজারে। পীতাম্বর বারুই-এর দোকানে বসে তবু সে খানিকক্ষণ এক আধ পয়সার কেনা-বেচা দেখ্‌ল। জোর একটা খবর ছিল চারদিকে। আরো বড় হচ্ছে নাকি রাজচন্দ্র সা-র দোকান—কাপড়ের গদির পাশাপাশি মনোহারি, তেজারতি, লোহালক্কড় সবই বিক্রী হবে এবার। ভৈরব বাজারের আড়ৎ থেকে দোকান দেখাশুনো করতে এসেছে স্বয়ং রাজচন্দ্র সা-র ছেলে রজনী সা।

পীতাম্বর হেসেই বলে: "কোন্‌দিন আমাকে ঠেলে দিয়ে না বলে আমরা পান-ও বিক্রী করব!"

"সেটি আর হয় না—" কথাটা সত্যি ভেবে ভরত যেন প্রতিবাদ জানায়: "বাজার ত আর রাজচন্দ্র সা-র নয়—এখনো ছোটকর্ত্তারই বাজার।"

"না রে না।" পীতাম্বর রসিয়ে বল্‌তে থাকে: "ছোটকর্ত্তা রেহান দিয়েছে বাজার সা-র পোর কাছে—নামেই জমিদার আসলে খোদার ষাঁড়!"

ধক্ করে কথাটা বুকে লাগে ভরতের: "তুমি ঠিক জানো, পীতাম্বরদা?"

"বলতে গেলে বাজারেই বসবাস—এটুকু আর জানিনে?"

বাজার থেকে সোজা পূবে দেখা যায় রায়বাড়ির ভাঙ্গামঠের মাথা-ভাঙ্গা চূড়া। সেদিকে চেয়ে থাকে ভরত। ভাবে, কেন এমন হয়? কোথায় গেল এত টাকাকড়ি, এত জৌলুস—কোথায় যায়? শঙ্কর রায়ের হাসি-হাসি মুখটা মনে করে ভরত। হাস্‌তে পারে কি করে

শঙ্কর রায়? ঠাকুদ্দারও ঠাকুদ্দারা দিয়ে গেছেন সে সম্পত্তি, তা পরের হাতে তুলে দিয়ে হাসে না কি কেউ? মাত্র পাঁচবছর ছোট্ট একটু জমিতে সে চাষ করছে, কিন্তু তার মায়াই ত সে আর এখন কাটিয়ে উঠ্তে পারে না। ভাবতে পারে না এ-জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সমস্ত পথটা ভারি পায়ে হেঁটে এল ভরত। উপরে পড়ে শঙ্কর রায়ের দুঃখটা গায়ে মাখিয়ে নিয়েছিল সে। ক্রমেই যেন সে মানুষের দুঃখ বুঝ্তে শিখ্ছে। আগে ত এমন ছিল না। রসিকও যখন দুঃখ করে, এতগুলো মুখকে রক্ত জল করে খাওয়াবার কথা বলে—সত্যি সত্যি ব্যথা পায় ভরত। বুচির ঘটনাটার পরও অযোধ্যাকে দেখ্লে—বয়েসের কালে অযোধ্যার সেই বুড়োটে মুখ—ভরতের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মনমোহন বেঁচে নেই—তার বাড়ির সব যে কে কোথায় গেল—ভাব্তে গেলে বুকটা যেন কেমন ফাঁপা হয়ে নুয়ে পড়ে তার। কোথায় গেল সিরাজ? বাজারের একটা মেয়েমানুষকে সিরাজের জন্যে কাঁদতে দেখেছে ভরত', তার জন্যও কেন যে ভরতের গলাটা টন্‌টন্ করে উঠেছে তা সে বল্‌তে পারবে না।

সুবর্ণকে দেখে যেন খানিকটা পাতলা হয়ে গেল মন। দাওয়ায় বসে বংশীকে মাই খাওয়াচ্ছে সুবর্ণ। কি দুর্দান্ত হয়েছে বংশী! মাই খাবার সময়ও একটু সুস্থির আছে কি না গ্যাখ! ফিরে ও জয়ামাল না হয়েই পারে না।

"বড়বাড়িতে কি খবর ছিল?" আগ্রহ নিয়ে সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে।

"বল্‌ছিল খাজনা দেবার কথা—তারিণীঠাকুর বল্‌ছিল। ছোটকর্ত্তা মাফ করে দিলেন।"

"দানের জমিতে খাজনা ধরে কেউ ?"

যত সহজে সুবর্ণ কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চায়, কাছারি বাড়িতে কথাটা তত সহজ মনে হয়নি ভরতের। ভালো করে জানত না সে শঙ্করকে—খাজনা থেকে যে সে রেহাই পাবে তার বা নিশ্চয়তা কি ছিল! গরুগুলোকে নিয়ে খালের ধারটা ঘুরে আসবে কি না ভাবছিল ভরত—অনেকদিন ওরা কাঁচা ঘাস খেতে পায়নি।

সুবর্ণ ডাকল : "এই শোনো—"

ভারি মিষ্টি লাগে সুবর্ণের এই ডাকগুলো। খুসী হয়ে এসে ভরত দাঁড়ায়।

"দুগ্‌গা আসছে।"

"কে বললে ?"

"সনাতনের ছেলের বউ ত টিয়ারার মেয়ে—তার কাছে খবর দিয়ে দিয়েছে আসবে। কুটির বাজারে কুরিদের মাল নিয়ে যাচ্ছে বোচন আজ—তাকে বলে দিয়েছি নিয়ে আসতে।"

"বলে দিয়েছ।"

"কেন, কি দোষটা হয়েছে! তুমি যেন সায়রে পড়লে। পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটা ত মাত্র বোন—তাতে আবার বিধবা—তোমাকে ছাড়া কি আর লক্ষ্য আছে ওর!"

ভরত একটু লজ্জা পায় : "আসবে ভালো। কতো দিন ওর সঙ্গে দেখা নেই, না ?"

"উত্তরের ঘর তুমি খালি করে দাও—ডোল বার করে আনো,

ধান সেদ্ধ আজই বসাব আমি, চাল তুলে ফেল্‌ব—আরো তোমার লোয়াজমা যা আছে সব পরিষ্কার করে ফেল।"

"বেশিদিন ত থাকৃছে না দুগ্‌গা—"

"কেন? বরাবরই থাকবে—দেওররা ওকে জ্বালা দিচ্ছে—ভাই থাক্‌তে ওখানে পড়ে থাক্‌বে কেন?"

সুবর্ণ তারপর ফিক্‌ করে একটু হেসে বলে: "ও, তোমার ভাতের চিন্তা লেগেছে বুঝি! তা আমার ভাতই দুজনে ভাগ করে খাব।"

কিসের যে চিন্তা ভরত ঠিক ঠাউরে উঠ্‌তে পারে না। তবে হ্যাঁ, চিন্তা ত একটা আছেই। নিজেকে সব সময় ঠিক ধরতে পারে না ভরত। সুবর্ণ যত সোজা রাস্তায় তাকে ধরে ফেলে তত সোজা রাস্তায় সে যেন চল্‌ছে না। তার বাঁক আছে বিস্তর, অলিগলি ঢের। দুগ্‌গার আসাটা মনের ভেতর একটা ছায়া জমাট করে তোলে ভরতের। একটু আগে সে যা ভাব্‌ছিল—সবার জন্যে যে তার ব্যথা লাগে—তা যেন কেমন গোলমেলে হয়ে যায়। ব্যথা যে লাগে তা মিথ্যে নয়—সুবর্ণ আর বংশীকে নিয়ে নিজে সে নিশ্চিন্ত আছে বলেই কি বাইরের লোকের ব্যথা এত বেশি করে বুকে লাগে তার? একটা শান্ত পুকুরের জলে দুগ্‌গা ঢিল ছুঁড়তে চায়। দুগ্‌গাকে নিয়ে নিজেদের বেড়টাকে এখন বড় করতে হবে, আগেকারই মত যে এখনও দিন কাটবে—তা-ও বা কে জানে?

প্রচুর ধূলো উড়িয়ে, কচি আম আর গাছের অসংখ্য পাতা লুটিয়ে একটা ঝড় হয়ে গেল—তার তুলনায় বৃষ্টি কিছুই না। এক ইঞ্চি পুরু

হয়ে মাটি তিজল কি না সন্দেহ। ভরত তাতেই খুসী—লাঙ্গলটা ধরা যাবে কোনো রকমে। জিরিয়ে জিরিয়ে হাতের মুঠো তার অবশ হয়ে পড়েছিল।

রসিক, ছিদ্দিক, এরা সবাই ক্ষেতে এসেছে, কিন্তু ভরতের মত লাঙ্গল-বলদ এনে কেউ উপস্থিত করেনি। দেখা যাক্ কালও একটা পশলা হয় কি না—তারপর ক্ষেতে নামলেই চল্‌বে। হবে, বৃষ্টি হবে, একবার যখন সুরু হয়েছে—নাগাড়ে দু'তিন রোজ না হয়ে যায় না। বৃষ্টির নাড়ীনক্ষত্র ছিদ্দিকের মুখস্তের মত।

"এসেছিস্ যখন, মেহনৎ দিয়ে যা, যতটা হয়ে রইল।" ছিদ্দিক বলে।

ছিদ্দিককে কেমন একটু সন্দেহ হয় ভরতের। বেশ ফাল চলবে মাটিতে অথচ ছিদ্দিক এমন গা-ছাড়া কেন? বৃষ্টি এলো বলে যেন ছিদ্দিক খুসী হতে পারেনি। তার দেখাদেখি সবাই এবার পাট করছে বলেই কি এমন ভাব তার? তাড়াতাড়ি হুঁকোটা ছিদ্দিকের হাতে দিয়ে কোমড়ের গামছায় কাছা এঁটে, ক্ষেতের ঢালু পাড় দিয়ে নেমে যায় ভরত। শুকনো মাটিতে বলদগুলো ঘাস খুঁজছিল। ওগুলোকে টেনে এনে লাঙ্গলে জুড়ে নেয়।

একা ভরতেরই আগ্রহ বেশি নয়। দু'চারজন আরো ক্ষেতে এসেছে। চৈতন ভরতকে দেখে এগিয়ে এলো—বোচন মাঝির ভাই চৈতন।

"মই এনেছিস যে বড় চৈতা—মই-ও দিয়ে যাবি নাকি আজ?" ভরত জিজ্ঞাসা করে।

"এককাণি ত জমি লাঙ্গল দিতে কতক্ষণ, যদি হয় মইটাও দিয়ে যাব। তামাক খাও ভরতদা—"

"নাঃ —এই ত টেনে এলাম।"

"ভেবেছিলাম নরম হয়েছে জমি—হয়নি। কষ্ট হবে লাঙ্গল দিতে।"

কথাটা ভালো লাগে না ভরতের।" যে করেই হোক দু'কাণিতে অন্তত লাঙ্গল চালিয়ে যাবে ভরত। দেখাবে ছিদ্দিককে লাঙ্গল চলবার মত যে মাটি ছিল।

"বোচন চলে গেছে রে চৈতা?" ভরত অন্য কথায় চলে যায়।

"সে ত কবেই—পশু´। দুগ্‌গাকে আন্‌বে না কি, ভরতদা?"

"হুঁ—"

পাশাপাশি জমিতে পাশাপাশি লাঙ্গল চালায় ভরত আর চৈতন। খানিক সমানে চলে কেউ আগুপিছু পড়ে যায়—পেছনে পড়ে থাকে চৈতন—হয়ত আবার ভরতকে গিয়ে ধরে—কিছুদূর সমান যায়—ছাড়িয়ে হয়ত যায় ভরতকে—আবার মোড়ের মাথায় দুজনের দেখা হয়। কথার বিরাম নেই চৈতনের। ডেকে-ডেকে কথা চলে।

"অযোধ্যা যে কি হয়েছে আজকাল জানো, ভরতদা?"

আর যা-ই হয়ে থাক, কাপড়টা আদায় হয়েছে ভরতের। কিছু হয়ে থাক্‌লেও এখন আর তার ক্ষতি কি?

"তারিণীঠাকুর বুচিকে নিয়ে থাকে।"

অবিশ্বাস না করেও ভরত ধমক দেয়: "ধেৎ—"

"তাহলে আর বল্‌ছি কি! খবরটা ত জল-ভাত, গাঁয়ের সবাই জানে, তুমি জানো না?"

"ওম্নি রটায় সবাই।"

"কি যে বল! দাদা ধরেনি গিয়ে অযোধ্যাকে? বলে কি জানো, কি করব, ভাত দিবি তোরা?"

"তা বাজারে নাম লিখিয়ে দিলেই হয়—আরো কামাই হবে!" ভরত কপাল থেকে ঘাম কেচে নিলে।

এবার চৈতন খুসী হয়েছে। ভরত প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল বলেই না কথাটাকে টেনে বাড়াতে হল। আরো ত কথা আছে তার আর তা বলতেও হবে।

"রজনী সা-কে দেখেছ, ভরতদা?"

"নাঃ—"

"তাহলে আর দেখলে কি? বাজারে যাওনি এর মধ্যে?"

"গেছি।"

"চোখে পড়েনি আর কি তবে! চেহারা ভালো। তাতে কি—জাতি সাপেরও ত চেহারা ভালো, মাথায় সুন্দর চক্কোর—কিন্তু বিষও তেম্নি।"

"ওরা পয়সাই চেনে। গাঁ লুটে নেবে এবারে।"

"পয়সা! তুমি কিছুই জানো না দেখছি।"

সত্যি চৈতনের মতো খবরদার সে নয়। ভরত ভ্যাল্‌ভেলে চোখ নিয়ে তাকায় চৈতনের দিকে।

"শালা বদমাস্। বৌ-ঝিদের উপর নজর দেয়।"

আরেকটা কাহিনী আশা করে' ভরত বলে: "তাই?"

"দেখবে ওর লাস্ একদিন পড়ে আছে আঘাটায়। শীতল

মহাপুরুতের বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করছে ক'দিন—টুনীকে বলেছেও বুঝি বা কি! টুনীর বাপকা বেটি—লাথি দেখিয়ে দিয়েছে!"

"শীতলমামা কি করলে তারপর?" খুব উৎসাহ দেখা যায় ভরতের।

"কি আর করবে? বললে, জমিদার ত নেই, নালিশ জানাব কার কাছে? দাদা শুনে বলেছে, জমিদার নেই, বোচন মাঝির হাত ত আছে, একটা রামদা' যোগাড় করো, তবেই হবে।"

বোচনকে ভালো লাগতে সুরু করে ভরতের, দুগ্‌গাকে আন্‌তে গেছে জেনেও ভালো লাগে। ভালো লাগে টুনীকে। আগেও অবশ্য ভালো লাগত। সে ভালো-লাগাতে মাত্রা চড়ে যায় একটু।

"ফের যদি অমন করে রজনী—গাঁয়ে সত্যি-সত্যি একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে—তুমি দেখো ভরতদা—"

"খুনোখুনি কেন হবে—ধরে বলে দিলেই হয়।"

"ভালো কথা শুন্‌বে শালা? টাকা আছে যে! বানিয়ে উল্টে মামলা রুজু করে দেবে—তারিণীঠাকুর ত এখন শালার সলা যোগাচ্ছে—জানো না? গদীতে হিসেব লেখার কাজ নিয়েছে—রেতে-রেতে যায়। কিসের কাজ? কার কি সর্ব্বনাশ করবে তারই সলা করে আর কি!"

"বাবুর বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে তারিণীঠাকুর?"

"ছাড়েনি—সে কাজ ত সকাল-বিকেলে, রেতের কাজ ত আর সেখানে হয় না!"

ফাল চলে না ভালো রকম। কোথায় মাটি ফুরফুরে হয়ে যাবে,

আল্‌গা-ই হতে চায় না। ফাটল যে কোথায় শুষে নিয়েছে সব জল। ঘামে পিঠ দুটো চক্‌চক্‌ করছে। সুস্থ সবল দুটো পিঠ—মেরুদণ্ডের দুপাশে ফোলা ফোলা শক্ত পেশীর বাঁধ—ঝাঁঝাঁল সূর্য্যের সঙ্গে আর কঠিন মাটির সঙ্গে লড়াই করে চল্‌ছে।

"তামাক খাবে না ভরতদা?"

"এ চক্কোরটা হয়ে নিক—তারপর জিরোনো যাবে, কি বলিস্?" খানিকটা দমে এসেছে ভরত। সত্যি জিরোনো দরকার।

ছিদ্দিক মিথ্যে বলেনি। পর পর তিনদিন বৃষ্টি হয়ে গেল। শুক্‌নো শ্মশানের মতো মাঠে সে এক অদ্ভুত সাড়া। যেন এ মাটিতে সাত রাজার ধন হীরা জহরত পোঁতা আছে, তারই সন্ধানে লাঙ্গলগুলো খুঁড়ে চলেছে মাটি। রসিক, রাইচরণ, ছিদ্দিক, চৈতন, ভরত—এদের কারু যেন বাড়িঘর স্ত্রীপুত্র নেই—যেন এই মাটিতেই তারা জন্মেছে—চোখ মেলে এই মাটিকেই দেখতে পেয়েছে। আর কোনো ঠিকানা—অন্য কোনো নিশানা তাদের নেই। ক্ষেতের উপরই সূর্য্যোদয়-সূর্য্যাস্ত হয়ে গেল দুদিন—বীজ ছড়ানোর পর তাদের ছুটি।

বাড়ি ফেরার পথে রসিক বল্‌লে: "এবার চল ভরত কালীবাড়ি! জন্মাবধি ত গাঁ-সিদ্ধি করে বসে রইলি, কোথাও বেরুলিনে!"

ছিদ্দিকেরও উৎসাহ দেখা যায়: "হেঁ—চল! পাহাড়ী মেগ্‌লিদের কাছ থেকে এবার কিছু কুম্‌ড়োর বীচি নিয়ে আস্‌ব। ভারি মিষ্টি কুমড়ো ওদের।"

ভরত একটু ইতস্তত করে বলে: "হেঁটে যাবি তোরা?"

"আমরা হেঁটেই যাব, তোর জন্যে না হয় পাল্কী-সোয়ারীই আনা যাবে।" ছিদ্দিক হেসে ফেলে।

"অনেক দূর তো!" লজ্জা পেয়ে ঘাড় নাড়তে থাকে ভরত।

"এক বেলার হাঁটাই অনেক দূর?"

"আসলে কি জানিস রসিক, বউকে ছেড়ে ও কোথাও নড়বে না!"

ছিদ্দিক ভীষণ সত্যি কথা বল্‌তে পারে। ভরত মনে মনে রেগে ওঠে তার উপর। বউ ছেড়ে ওরাও থাক্‌তে পারে না কি? ঠাট্টা ওদেরও করা যায়। সব মানুষকেই ঠাট্টা করা যায় ওরকম। আর কে কি বেশি জানে?—বৌ-ছেলেমেয়ে, বাড়িঘরদোর, ক্ষেতখামার ছাড়া আর কি বা কার আছে জানবার? এইত সব—এর মধ্যেই সবাই বাঁচে, সবাই মরে। তার বাইরে যদি কিছু থেকেও থাকে, সে-খোঁজ ভরত রাখতে চায় না।

"বউকে বল্‌লেই রাজী হয়ে যাবে! সাক্ষাৎ দেবতা—এত আর রায়বাড়ির কালী নয়।" রসিক তেরছা চোখে ভরতকে দেখে।

"যাব ত সত্যি। কবে যাচ্ছিস তোরা?" রায়বাড়ির কথায় আর কাণ পাতে না ভরত।

"কাল ভোরেই। পান্তা খেয়ে বেরুবো—চার ঘড়ি বেলা থাক্‌তেই ফেরা যাবে।"

"পূজো দিবি ত?"

"বারে—কালী দর্শনে যাবি, পূজো দিবিনে?"

"তাহলে ঋষিদের ওখান থেকে ত কবুতর কিন্‌তে হয়।"

"শোন্ ছিদ্দিক ভরতের কথা! আরে একি মাঠ-কালী পূজো? কবুতর ওখানে কেউ বলি দেয়? বলির দরকার নেই—একটা নৈবিদ্যি দিলেই চল্‌বে।"

"আবার কি?" ছিদ্দিক বাড়ির সামনের অশথ গাছটার নীচে দাঁড়ায়ঃ "চাট্টি চাল আর কলা দিয়েই ত তোদের পূজো হয়ে যায়!"

বড় একটা টিলার উপর কালীবাড়ী। তার পূবে অসংখ্য ছোট বড় টিলার ঢেউ—ঘন জঙ্গলের ঠাস-বুনোনি ছিঁড়ে ফেঁড়ে কোথাও লালমাটির ন্যাড়া শরীর বেরিয়ে আছে। টিলার ঢেউ লুসাই পাহাড় পর্য্যন্ত—তারপর বর্ম্মা। পশ্চিমের সীমান্তরক্ষী কালিবাড়ির পাহাড়। দেবী তাঁর উচ্চাসন থেকে সমতলের অসহায় মানুষগুলোকে অভয় দিচ্ছেন। ছোট জীর্ণ মন্দির—তার অধিষ্ঠাত্রী রক্ষাকালী কবে এখানে এলেন, কত তেলসিঁদুর যে তাঁর পাথরের রুক্ষ শরীর শুষেমুছে নিল কেউ তার খবর রাখে না। দেবী ফুল পান, ভোগ পান কিন্তু পূজোর মন্ত্র শোনেন না—পাহাড়ী মেগ্‌লরা মুরগী খায় তবু মাঝে মাঝে তারাই দেবীকে রাতের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে যায় বাতি জ্বালিয়ে। দেবীর সেবায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান এই নিরালা জংলায় বুনো মানুষদের সঙ্গে বাস করতে এগিয়ে আসেনি। ভয়ঙ্কর দেবীর বাসস্থান, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর সমতলের দুর্ব্বল মানুষগুলোর উপর তাঁর প্রতাপ।

টিলার নীচে দাঁড়িয়েই ভরত ভয় পেয়ে গেল : "ওখানে উঠ্‌তে হবে, রসিক ?"

"হ্যাঁ—দেখ্‌ছিস না আরো কত মানুষ দেখা যায়—"

"তোরা যা রসিক—আমি দেখি একটা মেগ্‌লিকে পাওয়া যায় কি না !"

"খুব দূরে চলে যাস্‌নে কিন্তু ছিদ্দিক—" ছিদ্দিকের জন্যেও ভরতের দুশ্চিন্তা।

"দূরে যাব কি ? ওই ত টিলার গায়ে কলাগাছ দেখা যাচ্ছে, ওটাই কারু বাড়ি হবে হয়ত।"

পথে ভরতের মনটা ভালো ছিল না। ছিদ্দিক আর রসিকের সঙ্গে কথা বলছে, হাসিঠাট্টাও করেছে—এমন কি গানও গেয়েছে দু'একটা কিন্তু এক লহমার জন্যেও ভরত আসবার সময়কার সুবর্ণের মুখটা তুলতে পারেনি। চোখে সুবর্ণের জল ছিলনা কিন্তু কি রকম যে ছিল চোখ-গুলো মনে করেলে সত্যি একটা কান্নার দমক উঠে আসে ভরতের গলায়। জোয়ান মদ্দ বলে সে কাঁদতে পারেনি, তাছাড়া ছিদ্দিক আর রসিক তাকে কিল্‌বিল্‌ করে ধরবে। এখন ভাবছিল ভরত, শশীদল থেকে এতদূরে সে এসে পড়েছে যে বুঝি জীবনে আর সেখানে ফিরে যেতে পারবে না।

ঝোপে ঝাড়ে সরু একটা লালমাটির রাস্তা দেখিয়ে রসিক বলে : "চল্‌ ভরত—"

দু'এক পা এগিয়েই ভরত জিজ্ঞাসা করে : "এই পাহাড়ে বাঘ থাকে, না রে রসিক ?"

"এখানে বাঘ পাবে কোথায়!—আরো ভেতরে আছে।"

"তবু আসে ত মাঝে মাঝে?"

"শুনেছি বর্ষায় বাঘের ডাক শোনা যায়!"

সে-ডাক কি রকম কে বল্‌বে? অনেক রকম অদ্ভুত আওয়াজই ত ভরত শুন্‌তে সুরু করেছে।

"আগে নাম্‌ত বাঘ, চিতাগুলো আমাদের গাঁ পর্য্যন্ত যেত—তা-ও এ-সময় নয়, শীতকালে।" রসিক গল্পের মত করে সহজে বলে যায়। চুপ করে বেহুঁশের মত রসিকের পেছন পেছন চলতে থাকে ভরত। আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎড়াই পথ। মেগ্‌লিদের তৈরী। মন্দির থেকে সুরু করে আদ্ধেক টিলা পর্য্যন্ত বাঁধানো ভাঙ্গা সিঁড়ি আছে—বাকি আদ্ধেকেও হয়ত কোনোদিন ছিল—এখন তার চিহ্নও নেই। সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে ভরত হাঁপাতে লাগ্‌ল, পরিশ্রমে নয়, আর ভয় নেই বলে।

রসিক বললে: "যাঃ—আর কি! এসে ত পড়্‌লুম।"

তাতেও উৎসাহ আসে না ভরতের। রসিক কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। সোজা, পরিষ্কার রাস্তা—ভরতের দিকে এখন তার না চাইলেও চলে। উঠে আসুক ও, যখন খুসী।

নীচে থেকে পুতুলের মতো যে লোকজন দেখা গিয়েছিল তারা আর কেউ নয়—বন্দুকধারী দুজন পুলিশ, আর এক দারোগাবাবু। মেগ্‌লিরা মদ চোলাই করে—হয়ত তাদেরই কেউ লুকিয়েছে এসে এখানে—ধরে চালান দিতে এসেছে এ-সব পুলিশের লোক। তবু রসিক ভয় পেয়ে গেল—পা চালাতে পারছিল না সে কোনো রকমে।

ভরত এসে পেছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল : "রসিক এরা এখানে যে!"

"চুপ—" আসামীর মত চেহারা নিয়ে রসিক বল্‌লে। দারোগা-পুলিশদের মাত্র একবার দেখেছে ভরত—রায়বাড়িতে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তারা—তার বাবার খুনের খবরের সময়। রসিকের চেয়ে কম ভয় করে না সে এদের।

সুলতানপুরের নদে চৌকিদারকে দেখে রসিক যেন হালে পানি পেলে! শ্বশুরের দেশের লোক—সামান্য পরিচয় ছিল। লোকটা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু তার চেয়েও ব্যস্ত রসিক ঘটনাটা জানবার জন্যে।

"চৌকিদারের পো—" সশ্রদ্ধ ভাবে ডাক্‌ল রসিক।

নদের যে ব্যস্ততার কোন কারণ ছিল তা নয়—সামনে এগিয়ে এসে বল্‌লে : "আমায় ডাক্‌ছ ?"

"সুলতানপুরের চৌকিদার নও তুমি—আমার কুটুম আছে সেখানে—"

"হেঁ—হেঁ—বল না কি ?" এবার সত্যি নদে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"সরকারী লোকজন কেন ভাই এখেনে ?"

"খুনে ডাকাত এসে লুকিয়েছে—"

"খুনে ?" রসিক আরো কিছু জান্‌তে চায়। তার পেছনে ভরত সশব্দে একটা ঢোঁক গিল্‌লে।

"আমাদের গাঁয়েরই। মহেন্দ্র তিলি। বৌ-ছেলেকে কুপিয়ে কেটে উধাও হয়েছিল—কালীবাড়িতে এসে লুকিয়েছে।" আর খবর

বিলি করবার সময় নদের নেই। দারোগাবাবুর কখন কি দরকার পড়ে কে বল্‌বে।

নদের পেছনে-পেছনেই রসিক আর ভরত মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। মন্দিরের দুয়োরের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পুলিশ দুটো কাকে যেন তাক করছিল। পাশে দাঁড়িয়ে দারোগাবাবু বল্‌লেনঃ "নদে—ওকে টেনে বার করে নিয়ে আয়—"

"হুজুর, শালা যদি—" নদে ইতস্তত করল। মন্দিরের ভেতরে একটা গোঙানি শোনা যায়। ভরতের মনে হল কোনো মানুষের আওয়াজ বুঝি ওটা নয়।

যা না—নইলে কি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকব এখানে?" নদেকে ধম্‌কে দেন দারোগাবাবু।

মন্দিরের মুখে ভয়ে ভয়ে একটু এগুলো নদে। ভেতরের আওয়াজটা কাৎরাণিতে এবার স্পষ্ট হলঃ "মা—তুমি সাক্ষী মা—আর কেউ না জানুক তুমি জানো কি দুঃখে বউএর মাথায়, ছেলের ঘাড়ে দা তুলেছি আমি—ওরা খেতে চায় আমি খেতে দিতে পারিনে—দোহাই মা, আমার কোনো পাপ নেই—আমাকে বাঁচাও তুমি—দু'দিন তোমার পা ধরে পড়ে আছি মা, দোহাই তোমার।"

নদে কি বুঝল সেই জানে—বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল মন্দিরের গুহায়। দারোগার চোখের চেয়েও রসিকের চোখে বেশি কৌতুহল। ভরতের হাত-পা যেন কেমন অসাড় হয়ে আস্‌ছে। বৌ আর ছেলেকে খুন করেছে লোকটা! ওদের খেতে দিতে পারে না বলে! ভেবে কূল পায় না ভরত, বৌ-ছেলেকে খেতে দিতে না পারলে তাদের খুন

করা যায় কি না। সুবর্ণকে সে মেরে ফেলতে পারবে—পারবে' কি বংশীর মাথায় দা তুলতে? একটা অদ্ভুত ব্যথায় আর ভয়ে ভরত জড়সড় হয়ে যায়। খুনেরা কি রকম মানুষ? তাদের মতই কি দেখতে?

ধরে আনতে হল না—নদের সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র ওম্নি বেরিয়ে এল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা আর লাল—ঝাঁটার মত চুলগুলো রুক্ষ আর ফ্যাকাসে। পঁয়ত্রিশের বেশি বয়স হবে না, তবু গায়ের চামড়া ফেটে আর কুঁচকে ছোট ছোট আঁশের মত দেখা যায়। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই কালীর দিকে মুখ করে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল মহেন্দ্র: "আমায় বাঁচিও মা—দয়া করো—"

এতক্ষণে নিরাপদ হয়ে দারোগাবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। পুলিশ দুটোর একজন চট্ করে মহেন্দ্রের হাতে হাতকড়া গলিয়ে দিলে। চাবী এঁটে দিয়ে ঘাড় ধরে মহেন্দ্রকে ঠেলে দিলে সামনের দিকে দু'হাত: "চল্ শালা—"

একটা হোঁচট খেয়ে প্রায় ভরতের পায়ের কাছেই উবু হয়ে এসে পড়ল খুনেটা। তারপরই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বাঁধা হাত দুটো জোড় করে বল্ল: "তোমরা বলো ভাই, আমি যেন বাঁচি।"

দারোগাবাবু হাঁটতে সুরু করলেন। হাতবাঁধা রোগাটে একটা খুনেকে উঁচোনো সঙ্গীনে পাহারা দিয়ে তার পেছনে পুলিশ আর চৌকিদার।

মন্দিরের দুয়োরে বসে বসে কি ভাবছিল ভরত। এক চিড় কলাপাতায় খানিকটা সিঁদুর নিয়ে এসে রসিক ভরতের সমস্তটা কপালে লেপে দিলে: "মা-র পায়ের সিঁদুর—মেখে নে।"

কপালে হাত বুলিয়ে ভরত হ্যালাক্যাপার মত রসিকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"দেখ্ছিস্ কি? সিঁদূর", আবারও বল্লে রসিক: "সাক্ষাৎ দেবতার পায়ের সিঁদূর! রক্ষাকালী যাঁর নাম, আপদবালাই আর থাকবে না!"

ষ্টেশনের ইঁটের দেয়াল ঘেরা লাল খাটো খুপরীরটা দেখা যায়। লাগালাগি ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টার—বেঁটে মজবুত দালান, ছোট জানালা, মনে হয় হাজতঘরের মত—দেয়ালের পাশে পেঁপে গাছটাও এখন নজরে আসে।

লগিটা নৌকোর গায়ে আড় করে রেখে ছিদ্দিক বলে: "আর কি, এসে ত গেলাম।"

"লগিটা এবার দে ছিদ্দিক—এইটুকু বেয়ে দি।" ভরত উঠে দাঁড়ায়।

"এতই সথ যখন—আয়। কবে আস্বি আর বাগান থেকে, কে বল্বে!" ছিদ্দিক ছইএর কাছে এগিয়ে এসে বসে।

হাতে লগিটা তুলে নিয়ে ভরত বলে: "তুই তামাক খেয়ে নে—" লক্ষ্য করছিল ভরত ঢিলে চামড়ার নীচে ছিদ্দিকের কণ্ঠনালীটা ধুকপুক করছে। কোন্দিন লগি-হাতেই ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে!

ছিদ্দিক তামাক খেতে উঠে যায় না—বসে বসেই পিঠের দাদ চুলকোয়।

ষ্টেশনের ঘাটে প্রায় এসে পড়েছে ওরা। দশ বারোটা নৌকো জড় হয়ে গেছে এরি মধ্যে। গাড়ীতে এসে পাঁচ সাতজন লোকও এ-ষ্টেশনে নাবে না। অনেকগুলো নৌকোকেই খালি-খালি ফিরে যেতে হয়। এখানেও শুধু পরিশ্রম করতে চাইলেই টাকা পাওয়া যায় না, তার জন্যে বরাত চাই। ভরত জানে, সপ্তাহে দু'তিনজনের বেশি যাত্রী মেলে না ছিদ্দিকের, তবু রোজই এসে তাকে ধর্ণা দিতে হয়।

ঘাটের দিকে চেয়ে থাকে ভরত। নৌকা থেকে দু-একজন যাত্রী নামে ষ্টেশনে—গাড়ীতে হয়ত কোথাও যাবে। হঠাৎ চমকে ওঠে তার চোখ। কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ের দিকে চোখ খাড়া করে তাকায়। একটা নৌকো থেকে এইমাত্র পা বাড়াল মেয়েটি—সাদা থান পরা। মুখটা দেখ্‌তে পায়নি ভরত—তবু মনে পড়ল তার দুগ্‌গার কথা। দুগ্‌গা যেদিন বোচনের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে শশীদল এসেছিল—সেদিনকার কথা।

দুগ্‌গাকে দেখে সুবর্ণের সত্যি কান্না পাচ্ছিল। এ-পোষাকে সুবর্ণ তাকে এই প্রথম দেখ্‌তে পাচ্ছে। কতই বা আর বয়েস—সুবর্ণের চেয়ে এক-আধ বছরের বড় হতে পারে। এই বয়েসেই সব সাধ-আহ্লাদ গেল মেয়েটার! সুবর্ণ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পাথরের মত নিঃসাড় হয়ে রইল।

নৌকোতেই পান খেয়েছিল দুগ্‌গা। পানের রস এখন প্রায় কালো হয়ে এসেছে ঠোঁটে। তবু হাস্‌লে এখনও সুন্দরই দেখায়। হেসে দুগ্‌গা তার নিটোল হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে: "ছেলে, না বৌঠান?"

বংশী প্রথমটায় একটু অনিচ্ছা দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে—তারপর হয়ত দুগ্‌গার হাসির টানেই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সুবর্ণ কথা বললে: "পিসি-কে চিনেছে—"

দাওয়ায় নিঝুম হয়ে বসে ছিল ভরত। বংশীকে কোলে নিয়েই দুগ্‌গা তাকে প্রণাম করলে।

"কখন রওনা হয়েছিলি?" ভারিক্কি গলায় বল্‌লে ভরত।

"খুব সকালে।"

বোচনকে তোরঙ্গ-প্যাঁটরা টান্‌তে দেখে ভরত এগিয়ে গেল।

"ভয় ছিল ঝড় উঠবে—কোনোরকমে সেরে এসেছি—" বোঁচকা-বুঁচকি ভরতের হাতে তুলে দিয়ে বোচন বলে।

"কদিন আগে ত এখানেও খুব ঝড়—" ভরত উত্তর দেয়। তারপর পেছন ফিরে চেয়ে দেখে বোচন চলে যাচ্ছে। "তামাক খেয়ে যা বোচা—" ভরত ডাকে।

"ঘাটে বেঁধে ত আসি নৌকাটা—" খালের দিকে নেমে যায় বোচন।

ভরতকে একা পেয়েই দুগ্‌গা অনুযোগ করতে সুরু করে: "একবার খবরটি নিলে না দাদা—কেমন আছি আমি!"

কেমন আর থাক্‌বি—আমি কি জানিনে?"

"শোন বৌঠান, দাদার কথা!" ছেলেমানুষের মত বংশীকে বুকে লেপটে নিয়ে হাস্‌তে থাকে দুগ্‌গা।

"আগে খেয়ে নাও ত! ঝগড়া ত পড়েই আছে।" সুবর্ণ রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে।

"দাদা কিন্তু ট্যাংরা মাছ খাওয়ার যম—ও মাছ থাক্‌লে কিন্তু আমি খাবো না বৌঠান!" বংশীর নরম ঠোঁটগুলোতে নিজের ঠোঁট মিশিয়ে দিয়ে দুগ্‌গা চুমু খেতে থাকে।

"নায়রী এসেছ না কি! যা থাকে তা-ই খেতে হবে।" সুবর্ণ সহজ ভাবে বলে যায়।

"তুমিই পেট ভরে খাও তাহলে—চিঁড়ে খাইনি না কি নৌকোয়—মনে করেছ?" খিলখিল করে হেসে ওঠে দুগগা।

দুগ্‌গাকে নিয়ে পাড়াটা একটু সরস হয়ে উঠল। বহুদিন পর গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে বলে নয়—গাঁয়ের ছেলেরা আজকাল নতুন লায়েক হয়ে উঠেছে। রজনী সা-র গদীতে দু'চারজন যারা চাকরি করে, পাঁচ সাত টাকা মাইনে পায় আর সহুরে ইয়ার্কি বাসি হয়ে গেলে শিখে নেয়, তারাই। বাজারের মেয়েমানুষে আসক্ত হওয়া তাদের বিবেচনায় সাবেকী চাল—দারিদ্র্য যখন রোদ জলের মত সবার ঘরে লেগেই আছে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ন্ত মেয়ের অভাব কি! বয়স্করা চোখ বুঁজে থাকে—দারিদ্র্যই তাদের চোখ বোঁজায়—আর নইলে ক্ষেতখামারে এতই মাথা দিয়ে রাখে যে তার বাইরে মন দেবার মন তাদের নেই।

টেরী-কাটা ফর্সা গেঞ্জী পরা মহিমের সঙ্গে দুগ্‌গার যেথানেই দেখা হোক, ছেলেটা শীষ দিতে থাক্‌বেই। কাৎ হয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে ছুটে পালায় দুগ্‌গা: "মরণ নেই তোমার?" মুখ ভরা হাসি ছিটিয়ে যায়। তাতেই মহিমের বুকটা ফুলে ওঠে—জোরে একটা নিশ্বাস নেয় সে। তারপর গুনগুনিয়ে একটা ইয়ার্কির গান গেয়ে বাজারের পথ ধরে।

সাবধানী চোখেয়া দুগগাকে ভাবে বে-তরিবৎ। সময় সময় হুল্‌ ফোটাবার চেষ্টায় গুঞ্জন ওঠে। আবার এক সময় তা চাপাও পড়ে যায়।

স্থবর্ণ ভরতকে সাবধান করে: "রাড়ীর আবার অত রং-ঢং কেন? পাড়া-পাড়া টই-টই করে না বেড়ালে কি হয় না? এই ত গেছে অযোধ্যার বাড়ি! বুচিত' না কি—" স্থবর্ণ আর এগোতে পারে না।

"ওকে আমি আগলাই কি করে? তুমিই বলে দাও—"

"কি কথার ছিরি! তোমার বোন—পাঁচদশ কথা তুমি বল্‌তে পার। আমি পারি না কি?"

"মার আদুরে ছিল—এখনও তাই রয়ে গেছে!"

স্থবর্ণ হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কালো হয়ে থাকে। আর কোনো কথা ভাঙতে চায় না।

বোচনের নৌকোর ছইটা মেরামত করে দিতে হবে। গায়ে গছে দুগ্‌গাকে নিয়ে এল বোচন, তার এই সামান্য উপকারটুকু ভরত করে দেবে না! বিশেষ বাঁশবেতের কাজে ভরত একজন মস্ত কামিলা।

ভরত কাজ করে যায়। তামাক টান্‌তে টান্‌তে বোঁজা-বোঁজা

চোখে তা-ই দেখে বোচন। বাঁশের চিল্‌তেগুলো লিক্ লিক্ করে ওঠে ভরতের দা-য়ে, বেতের বুকোগুলো কুণ্ডলী খেয়ে পড়ে থাকে।

"দু পলট গাব দিয়ে দিস বোচা—ছই-এর উপর—দরমাগুলো ভালো নয়—বর্ষায় টিঁকবে কি না সন্দ—"

"নৌকোও তুলে ফেল্‌ব—গাব বুলিয়ে রাখতে। খালের জলও কাবার হয়ে এল, এখন আর চল্‌বেই না নৌকো।"

একটা মেটে রং-এর ছেঁড়া ভেজা গামছা কোচরে জড়ানো—ত্রিকোণ জাল কাঁধে ফেলে চৈতন এসে উপস্থিত হয়। ধোয়া মাগুর মাছের মত সিঁট্‌কে গেছে ওর শরীরটা।

"মাছ পেলি, চৈতা?" ভরত উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"কোথায় মাছ, ইচাগুঁড়ি আর গ্যাদা ট্যাংরা।" চুবড়িটা চৈতন ভরতের চোখের নীচে নিয়ে ধরে—তারপর মাটিতে রেখে দেয়।

বোচন চুবড়িটা তুলে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

চৈতন এবার নিবিড় হয়ে ভরতের কাছে এসে বসে:

"ভরতদা, তোমায় একটা কথা বলব—ভাবছিলাম।"

মুলি বাঁশ ফালি করতে করতে ভরত চৈতনের দিকে তাকায়।

"দুগ্‌গাকে বলে দিও অযোধ্যার বাড়ি যেন না যায়।"

"কেন?" ঠোঁটটা ভরতের শুকিয়ে আসে।

"শুনি বুচির সঙ্গে না কি ওর খুব খাতির—বুচির খবর ত তুমি জানো!"

"মেয়েলোকের ব্যাপারে মন দিস্‌নে, চৈতন—" কাজে মনোযোগ দেয় ভরত।

"গাঁয়ে একটা কথা উঠেছে কি না—তাই বলছিলাম।"

"কথা? কি কথা?"

"তারিণীঠাকুরও না কি হাসি মস্করা করে দুর্গার সঙ্গে।"

ভরতের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। দুর্গাকে খুব বেশি আপন ভাবে না ভরত—ভরতের রক্তেমাংসে দুর্গার জন্য ব্যথা নেই। তবু সে তার বোন। দুর্গার খারাপ হয়ে গেলে সে ছটফট করে উঠবে না, একটা ভারি ওজনের পাথর যেন তাকে পিষে ধরবে। চুপ করে গুম মেরে রইল ভরত—যেন গাঁজায় একটা কড়া টান টেনে এইমাত্র কল্কেটা রেখে সে নেশার অপেক্ষা করছে। চনচন করে সমস্ত রক্তে নেশা ধরল তার। তারিণীঠাকুর হাসিমস্করা করে? দুর্গা তাতে হয়ত মজাই পায়। তারি জন্যে ছুটে ছুটে তার অযোধ্যার বাড়িতে যাওয়া! সুবর্ণের চোখেও লেগেছে তাই। গাছের গুড়িতে দায়ের আছারটা ঠুকতে থাকে ভরত। জয়মালের ছেলে সে, দা-ও ধরতে জানে কিন্তু তারপর? তারপর যা তা সে পারে না। পারে না সে দা-চালাতে মানুষের গায়ে। মহেন্দ্র কি করে চালিয়েছিল দা? মহেন্দ্রের মুখটা মনে পড়তেই ভরতের হাত থেকে দা-টা আলগা হয়ে খসে যায়।

"তারিণীঠাকুরকে সাবড়ে না দিলে চলবে না—বুঝলে ভরতদা? দাদাকে আমি বলেছি।"

"কি বলে বোচা?"

"চুপ করে থাকে। চুপ করে থেকেই একদিন দেবে—"

"হুঁ—"

"দুগ্‌গাকে তুমি কিন্তু সাবধান করে দিও।"

দুগ্‌গাকে সাবধান করতেই এসেছিল ভরত। দুগ্‌গা তার লক্ষীর ঝাঁপি থেকে সিঁদুর-মাখা একটা টাকা বার করে বলে: "বংশীর জন্যে একটা জামা এনো দাদা বাজার থেকে। গোলাপী রেশমের জামা—চক্‌চক্‌ করে যে তেম্নি। বাজারে পাওয়া যায় শুনেছি।"

ভরত আগে থেকেই শুকিয়ে উঠেছিল এখন মনে হল সে চুরি করতে ঘরে ঢুকেছে।

"বারে—ধর, নাও।"

অনিচ্ছায়ও হাত পাতে ভরত। আঙুলের ডগার সিঁদুরটা দুগ্‌গা আঁচলে মুছে ফেলে। মনে হয় ভরতের, কপাল থেকে বুঝি দুগ্‌গা মুছে আন্‌ল সিঁদুরটা। আনন্দের বয়েস ছিল অনেক—হাড়গিলের মত টিল্‌টিলে পেট, বোনাইকে দেখে ভরতের গা-বমি করে উঠেছিল মনে পড়ে। বিয়ের পর এক বছরও বাঁচেনি লোকটা। দুগগা চলে আস্‌তে চেয়েছিল এখানে—বাবা আস্‌তে দেয়নি। তারপর মুখ বুঁজে টিয়ারাই পড়ে ছিল দুগ্‌গা—তার টুঁ শব্দটি কেউ শোনে নি। আনন্দের মস্ত গোষ্ঠী—ছেলে, যোয়ান, বুড়োতে পাড়া গিস্‌গিস। নষ্ট হলে দুগ্‌গা ওখানেই হতে পারত! ভরত নরম হয়ে যায়। দুগ্‌গার হাসি-হাসি মুখটার দিকে চেয়ে আজ প্রথম তার কান্না পায়। সে ছাড়া তিনকূলে ত তার কেউ নেই। কি একা, অসহায় মেয়েটা! কতদিন বাঁচবে কে জানে? কিন্তু যতদিন বাঁচে এম্নি একাই ত তাকে থাকতে হবে!

"সুন্দর দেখে আন্‌বে কিন্তু। জরী থাকে ত খুব ভালো।"

"সা-র গদীতে দেখেছি পিরণ।" ভরত আর চুপ করে থাকে না।

"মস্ত না কি দোকান—থাক্‌বেই ত! "ফর্সা কাপড়টাকে ছিমছাম করে নিয়ে দুগ্‌গা উঠে দাঁড়ায়।

কালোমাটির মেঝে—বৃষ্টির ছাঁট লেগে কালো ছ্যাংলা পড়া বাঁশের ছ্যাঁচা বেড়া—আর ময়লা খাটো ধুতি পরা ভরতের কালো চেহারাটার সামনে বড় বেশি পরিষ্কার মনে হয় দুগ্‌গাকে। ভরত অস্বস্তি বোধ করে না—লজ্জায় বরং নুয়ে পড়ে। অবস্থা ভালো ছিল আনন্দের। অন্ততঃ ভাত-কাপড়ের অভাব দুগ্‌গা জানে না। নিজের আর দুগ্‌গার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ দেখতে পায় ভরত। অনর্থক সে দুগ্‌গাকে কিছু বল্‌বার সাহস করেছিল।

বিঘৎ খানেক চারা উঠেছে পাটের কিন্তু আগাছার তেজই বেশি। মাটিতে জল পড়লেই হল—দেখবে ফনফনিয়ে রাতারাতি আগাছা দাঁড়িয়ে গেছে। বিষ্টির আগে মাটি বেছে গ্যাখ—শুক্‌নো গুঁড়ো শিকড় ছাড়া আর কিছু পাবে না।

নিড়েন চল্‌ছিল ক্ষেতে। ছিদ্দিক ডেকে বল্‌লে: "আলে নিয়ে যে জড় করছিস ভরত—টুক্‌রিতে তুলে নে বেকুব, গরুতে খাবে।"

নিড়েনী দিয়ে পিঠ্‌টা আচড়ে ভরত জিজ্ঞাসা করে: চারাগুলো সব বাঁচবে, ছিদ্দিক?"

"খরান পেলে মরবে।"

"তাহলে ত সবই গেল!"

"কেন?"

"আউস যে করলুম না।"

"তা জল আর খরানই ত আমাদের দেবতা।"

খরার কথাটা ভরতের মনে গোল পাকাতে থাকে। ধান যা আছে টেনে-টুনে তার আর সুবর্ণের হয়ত আশ্বিন-কর্ত্তিকতক হয়ে যেত। কিন্তু দুগ্‌গা এলো যে! ভাদ্র পর্য্যন্ত চল্‌লেই ঢের।

"তোর বুনটা এসেছে শুনি ভরত?" হাঁকাহাঁকি করে ছিদ্দিক জিজ্ঞাসা করে।

"সেই ত ভাবছি—পাট মরে গেলে খাব কি রে!"

"বুনের নিকে দিয়ে দে—"

"দূর, আমাদের তা হয় না—"

"রসিকদের হয়, আর তোদের হয় না কেন?"

"আমরা কায়েত, বলে সবাই।"

"যা যা—চাষা চোয়াড়দের আবার জাত—তারা সবাই এক জাত।"

"তা *ঠিকই বলেছিস্*।"

"তবে আর কি? বুনটার একটা জামাই জুটিয়ে দে।"

"ভাবছি।"

"ভাবছিস্ কি মাথা? ওসব বাড়ন্ত মেয়ে ঘরে পুষে রাখতে নেই, দুষমণ হয়ে দাঁড়ায়।"

"ভাবছি কবরেজমশাইকে বলে দেখব একবার—বামুন মানুষ দেখি কি বলে।"

"তোর ত বুন—কবরেজ আবার বলবে কি? বেইজ্জতি ঘটে গেলে কবরেজ এসে সাম্‌লাবে?"

ভরত চুপ করে যায়। ছিদ্দিকও হয়ত কিছু শুনেছে। তাই এই সোজা পথ সে বাৎলে দিতে চায়। কচ্ছপের মত নড়েচড়ে নিড়েনী চালায় ভরত। তবু কাণ খাড়া রাখে। ছিদ্দিক আবার কি বলে ফেলে তাই শোনবার জন্যে।

বক আর বালিহাঁস উড়ে যায়। এক নজর চেয়ে বলে ভরত: "বক উড়ছে—ধুম বিষ্টি হবে—দেখিস্ ছিদ্দিক।" এ-ছেলেমান্ষিতে ছিদ্দিক উত্তরই দিত না অন্যসময় হলে। চালাক মানুষ—বুঝতে পারে যে ভরত অন্য কথা পাড়তে চায়। তাই বলে: "বক উড়ছে তাই বিষ্টি হবে? জল পাচ্ছে না, তাই উড়ে যাচ্ছে জলা দেশে।"

"তুই কি বলিস্ বিষ্টি হবে না?" আবারও আশঙ্কা জানায় ভরত।

"হবে-হবে—এখন যে কাজ করছিস্ তাই কর।" মুরব্বিআনা দেখায় ছিদ্দিক।

"না সত্যি বল্‌ত ছিদ্দিক—পাট মরে গেলে কি করব?"

"কি করবি? রজনী সা-র ওখানে গিয়ে খত সই করবি।"

"কেউ করে?"

"করে না? জমিদার ইস্তক বাদ গেল না আর আমরা কি রে?"

"তুই করেছিস?"

"কত! বুড়ো আঙ্গুল ভোঁতা হয়ে গেল টিপ মেরে মেরে।"

কি ভীষণ কথা ছিদ্দিক অনায়াসে বলে যাচ্ছে! গাঁয়ের আদ্ধেক জমি অবশ্য এখন রজনী সা-র। কি করে তার এ-জমি হল ভরত যেন এখন একটু একটু বুঝতে পারে। সনাতন-ওদের জমি ছিল, এখন নেই—ও বাড়ীর যোয়ান ছুটো ছেলে রজনী সা-র ক্ষেতে জন খাটে

এখন। বর্গাদার বলতে রজনী সা ছাড়া কেউ নেই। জমিদারের বর্গার জমি নেই। খাসে আছে এক দ্রোণ মত—তা-ই সব। সত্যি বলতে জমিদার এখন রজনী সা। চাষীদের জমি তার কাছে গিয়েই জড় হচ্ছে।

"টাকা তুই ফিরিয়ে দিস ত আবার---না ছিদ্দিক ?"

"তা দিই। খোদার ফজলে দিয়ে যাচ্ছি। দু'ফসলি জমি আছে—ভাবতে ত হয় না।"

"দিয়ে দিলে আর ক্ষেতি কি ? সব সময় ত আর টাকা থাকে না মানুষের হাতে !"

"ক্ষেমা দে ভরত। পাটের টাকা পেলে কিন্তু এবার ঘাটু নাচ—তোকেও মাঠত দিতে হবে।"

"মসজিদ দিবি যে বলেছিলি—খুব ত দিলি !

"সে নানীর সঙ্গেই গেছে। কত গুণা-ই করছি—আরেকটা গুণা হল।"

ছিদ্দিক নমাজ পড়ে, দরগায় সিন্নি দেয়—কোথায় তার গুণা ? গুণার ভয়েই সে তবু জড়সড় হয়ে আছে। ভরত শুনেছে মেঘনার চর নিয়ে মুসলমানেরা কোপাকোপি করে—তারা কেমন মুসলমান ? মুসলমান ভাবতে ভরত ছিদ্দিককেই বোঝে—যার সঙ্গে তার কোথাও তফাৎ নেই। একই রকম ভাবে তারা, একই রকম কথা বলে—একই রকম তাদের দুঃখ আর সুখ। বুড়ী নানী মরেছিল যখন, ছিদ্দিক ঠিক তেমি ভাবেই কেঁদেছিল—জয়মাল্যের খুনের খবর পেয়ে যেমি কেঁদেছিল ভরত। তবু তারা এক নয়। ছিদ্দিক মুসলমান।

মুসলমান ওই কথাটার জন্তেই যেন সে আলাদা। কেন আলাদা? তার জবাব পায় না ভরত।

ছিদ্দিকের পাশে থেকেই ছিদ্দিককে নিয়ে নানারকম ভাবতে থাকে ভরত। ক্ষেতে এলেই সে ভুলে যায় সুবর্ণের কথা—বাড়ি গেলে যেম্নি ছিদ্দিককে আর তার মনে থাকে না। কিন্তু একটা কথা সব সময়ই তার মনে থাকে। কখনো তা ভুলতে পারে না ভরত। তার জীবনে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে বড় হয়ত তা-ই—এই পাঁচ কাণি ক্ষেত।

•

আটহাতি কাপড় সোডায় কেচে কেচে ফিকে মেটে রং ধরে গেছে—তা-ই ভরতের ধোলাই কাপড়। কোনো রকমে হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়ে একটা কাপড় পরল ভরত—আরেকটা কাপড় ভাঁজ করে গামছার মত কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে। দুগ্‌গা বল্‌লে: "এমন রুক্ষু মাথায় কেউ যায় কোথাও?—কাঁকই দিচ্ছি, চুল আঁচড়ে নাও।" দুগগা তার লম্বা চুল আঁচড়াবার মোষের শিং-এর একটা বড় চিরুণী বার করে দেয়। চুলে দুটো টান দিয়েই ভরত বলে: "নে হয়েছে—অত দেখাতে গেলে হয়ত আবার খাজনা চেয়ে বস্‌বে!" কাঁধের কাপড়টাও ভরতের দরকার ছিলনা—দুগ্‌গা পীড়াপীড়ি করলে—বলে, ওম্নি উড়নচণ্ডীর মত যাওয়া না কি ভালো নয়। জমিদার-বাড়িতে ভরত ত আর এই নতুন বাচ্ছেনা—সাদামাটা একটা ধুতি পরেই হামেসা দৌড়িয়েছে। কিন্তু দুগ্‌গা বলে, "আমি না থাকতে যা খুসী করেছ, তাই বলে এখন তা পারবে না।" পরের মর্জ্জিকে খুসী করে যে কাপড়চোপড় পরতে হয় তা-ও বাৎলে দেয় দুগ্‌গা। অগত্যা ভরতকে সবই করতে হয়।

তবু দুগগার খুঁতখুঁত গেল না: "কদমকেশরের মত কি কতকগুলো খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে—বাজারে গিয়ে কামিয়ে আস্‌তে পারো না?" ভরত গালে হাতটা বুলিয়ে নিয়ে হাসে।

কিন্তু কেন? জমিদার আবার ডাকলেন কেন? সমস্তটা পথ ভেবে কিছু কূলকিনারা করতে পারল না ভরত। কাঁধের কাপড়টাকে চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে সদর দালানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

শঙ্কর তারিণীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করছিল। ভরতকে দেখে বল্‌লে: "বোস।" ভরত বসল কিন্তু মনে একটা দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছিল তার। নির্ঘাৎ জমিদার এখন খাজনার কথা পাড়বে। তারিণীঠাকুর এতক্ষণ বসে বসে জমিদারের কাছে কত কি লাগিয়েছে কে জানে! হয়ত বলেছে, ভরতকে আর খাজনা মাফ করা যায় না—ব্রহ্মোত্তর যাদের ছিল তারাও যখন কিছু কিছু দিচ্ছে, একা ভরত বাদ যাবে কেন? লোকটা সাংঘাতিক, কিছুই তাকে দিয়ে অসম্ভব নয়। তবে তারিণীঠাকুর হয়ত বলবে না—ভরতের মনে ছোট্ট একটু আশা টিম্‌টিম্ করতে থাকে। দুগ্‌গার ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়—তারিণীঠাকুর হয়ত কিছুই বলবে না। ভরত খানিকক্ষণের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

শঙ্কর তারিণীঠাকুরের সঙ্গেই কথা বলে চল্‌ছিল: "দেখুন, মান-সম্মান আমার নেই কারণ আমার টাকা নেই। তবু শিবরাম রায় জমিদার ছিলেন তার ছেলে আমি আর এ-বাড়ি জমিদার বাড়ি। এ বাড়িতে আমার চাকরি করে যদি আপনি রজনী সা-র ওখানেও আবার চাকরি করতে যান তাহলে আমার না হোক আমার বাবার নামের অপমান হয়।"

"চলে না বলেই ত বাবু গদীতে হিসেবটা লিখে দিয়ে আসি।"

"সব বুঝি। এখানে যা মাইনে পান তাতে পরিবার প্রতিপালন চলে না। অন্য একটা কাজও খুঁজতে হয়। কিন্তু তাতে এ বাড়ির অপমান ত!"

তারিণী নিরুপায় হয়েই একটু খোঁচা দিতে চাইলে: "রজনী সা-কে যখন বাবু বাজার ইজারা দিলেন—তখন ত সত্যি এ-বাড়ির অপমান হয়েছে।"

"না তা অপমান নয়। আমার টাকা নেই—টাকার দরকার—টাকার জন্যে সম্পত্তি আমি বেচে দিই, তাতে আমি যে অক্ষম সে কথা বোঝায়, বোঝায় না যে এ বাড়ির আমি অপমান করেছি। রজনীর সঙ্গে যদি আমি ব্যবসা ফেঁদে বসতাম—তাহলে হত সত্যিকারের অপমান।"

"আমার ত উপায় নেই বাবু—রজনীর ওখানে আর ক'টা টাকা।"

"উপায় কি কারু আছে, তারিণীবাবু? আমার অবস্থা ত আপনার চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না। বলতে পারেন আরো ত জমিদার আছে—তাদের অবস্থা ত এমন নয়—তোমার কেন এমন হল? তুমি নিশ্চয়ই অপদার্থ। অপদার্থ আমি ঠিক কারণ আঁকড়ে রাখবার মত শক্ত মুঠো আমার নেই। কিন্তু তেমন মুঠো কারু কি আছে? ওরা জমিদার—মহাজনী ব্যবসা করে জমিদার! কড়া সুদে চাষীদের টাকা কর্জ্জ দেয়—সে টাকা থেকে জমির খাজনা কেটে রাখে। জমিদারের মহাজনী জমিদারির সবচেয়ে বড় অপমান। সে অপমান

এ বাড়ির যাতে না হয় আমি তাই করেছি, জমিদারি আমার যেতে পারে, কিন্তু মানুষ ত রয়ে গেছি!"

ভরত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কি যে বলে শঙ্কর রায় ভরতের মগজ পর্য্যন্ত তা পৌঁছায় না। তবে এটুকুতেই সে খুসী হয় যে তারিণী ঠাকুরকে জমিদার আর রাখতে চায় না।

তারিণীঠাকুরের ছোট ছোট চোখগুলোর দিকে চেয়ে শঙ্কর বলে যায়ঃ "কেউ বাঁচবে না। টাকা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—সর্ব্বনাশ করবে। বৃটিশ আমল টাকা বলে যে জিনিষটি আমদানী করল, সেই রূপোর রূপেই আমরা ডুবেছি। সরকারকে লাটের খাজনা দিতে হত টাকা—ধানচাল নয়। জমিদারেরও তাই চাষীদের কাছ থেকে টাকা চাই—ধানচাল নয়। জমিদার তাই বাজারহাট তৈরী করলে—সেখানে চাষীরা ফসল বিক্রি করে, তাঁতীরা কাপড়, কলুরা তেল বিক্রি করত জমিদারের পাওনা মেটাবার জন্যে। টাকার গন্ধে একটা জাত তৈরী হয়ে গেল যারা চাষীও নয় জমিদারও নয়—তারা সং-বেণে, রাখী ব্যবসাদার। মাল কেনাবেচায় সুরু হল তাদের ব্যবসা—আর শেষ হল তাদের কাজ ফসলের দাদন হিসাবে টাকা কর্জ্জ দিয়ে। এরা আজ মহাজন, টাকার মালিক, জমির মালিক। জমিদারের জমি নেই—চাষীদেরও থাকবে না—এরাই গিলে রাখবে সব।"

তারিণীও কিছু বুঝতে পারছে বলে মনে হল না। সেও মাছের মত চোখ নিয়েই শঙ্কর রায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝুক না বুঝুক অমনোযোগী হওয়া তার চলবে না। মুনিবের ভয় আছে—পাছে মুনিব অসন্তুষ্ট হন সেই ভয়।

শঙ্কর বকেই চলেছে: "টাকা পেলে চাষীরা। ক্ষেত থেকে কাঁচা মাল তুলে দিয়ে চাকৃতি নিয়ে ঘরে ফিরল। কিন্তু এ চাকৃতি নিয়ে কি করতে হয় তা-ত তারা তখনও জান্ত না। টাকা যে পুঁজি করে রাখতে হয়, সে খবর কেউ তাদের বলে দেয়নি। টাকা গলিয়ে বৌ-এর গয়না তৈরী করেছে তখন তারা। কিন্তু যখন দেশে আসত দুর্দ্দিন, সে টাকা আর ফিরে আসতনা গয়না থেকে—হাত পাতত গিয়ে তারা তখন মহাজনের কাছে। টাকায় তিন টাকা সুদ দিতেও কেউ আপত্তি করে নি!"

শঙ্কর পায়চারী করতে সুরু রেকল। তার ময়লা খদ্দরের ফতুয়াটার দিকে চেয়ে ছিল ভরত। শিবরাম রায়ের গায়ে থাকত ঢাকাই জরীপাড় ওড়নী। তার ছেলে—এখনও যে তাদের জমিদার—তার পরণে এ কি সব কাপড়চোপড়! তাছাড়া কি অদ্ভুত পাগলের মত কথাবার্ত্তা বল্‌ছে সে! হয়ত পাগলই হয়ে গেছে। ভরতের একটু ভয়-ভয় করে। কোণঠাসা বরকন্দাজদের লাঠি থেকে একটা তুলে নিয়ে মারতেই যদি তাকে সুরু করে শঙ্কর, কি তখন করতে পারে সে? পাগলের গায়ে জোর থাকে অসম্ভব। দুশ্চিন্তায় ভরতের মুখটা কাহিল দেখায়।

"অপরাধ জমিদাররা বিস্তর করেছে—" আবার সুরু করলে শঙ্কর: "ঢের অত্যাচার করেছে চাষীদের উপর—তবু একই মাটির লোক তারা, জমিদার আর চাষী। রক্তের সম্বন্ধে তারা বাঁধা। আমরা শুষে নিয়েছি আবার দিয়েছিও। কিন্তু মাটির সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই মহাজনের—তারা শুধু নিয়ে যায়—দেয় না।"

তারিণী এবার খোসামোদের একটা সূত্র খুঁজে পেল: "বাবু যা বলেছেন! রজনী সা-র কথাই বলছি—গাঁয়ের জন্য একটা পয়সা খরচ কর—না ওদিকই ও মাড়াবেনা! স্বর্গীয় কর্ত্তারা কি না করে গেছেন—দিঘী বল, সড়ক বল, বাজার বল সব আছে—বাস্তব্যের একটু অসুবিধে ছিল না!"

"আমার ইচ্ছে ছিল একটা স্কুল করব—পয়সা নেই—হয়ে উঠলনা।"

"একটা হাসপাতালেরও দরকার।"

"দরকার অনেক কিছুরই। মানুষেয় সামান্য সুখ সুবিধা নিয়ে বেঁচে থাকবার উপায় গাঁয়ে নেই। গাঁয়ে যে মানুষ থাকে—মানুষ বেঁচে থাকে, নিজেকে কতখানি বঞ্চিত করে যে এরা বেঁচে যায়, তা এরা জানেনা বলেই এখনও ক্ষেতে লাঙ্গল চলে।"

এর পিঠের কথা তারিণীর জানা নেই। বেশ ত আছে সে—কেবল চাকরীটা চলে গেলে একটু অসুবিধায় পড়বে! তবু ভাতে ত আর মরবে না। পঞ্চাশঘর যজমান আছে—বাপপিতাম'র ব্যবসাই ধরবে না হয়। চরিত্রের যখন একটা বদ নেশা আছে যজন-ব্যবসায় তাতে ব্যাঘাত ত হবেই না বরং সুবিধা হবে প্রচুর।

"ভাল কথা মনে পড়েছে তারিণীবাবু" শঙ্কর আবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে: "রজনী সা-র চাকরী আপনি ছেড়ে দিন—পাঁচ সাত টাকা আমার এখানেই বেশী পাবেন।"

"তাহলে ত আমি বেঁচে যাই, বাবু!"

"হাঁ—আমার এখানেই থাকুন। আমরা সহরে চলে যাচ্ছি। মাস

কয়েক ত থাকবই, সমস্ত দেখাশুনার ভার আপনার উপরই থাকবে। কাজ বেড়ে যাবে ত? কাজেই বেতনটাও বাড়িয়ে নিন।"

খুসীতে গোলাপী হয়ে উঠ্‌ল তারিণীর মুখ।

ভরত দেখ্‌লে বাবু স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ হয়ে এসেছেন। বসে বসে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে তার। এবার একটু উস্‌খুস্‌ করে উঠল তাই।

"আচ্ছা তারিণীবাবু—আপনি এখন যান।" একটা খবরের কাগজ টেনে নিলে শঙ্কর। তারিণী চলে গেল। ভরত সাত পাঁচ ভেবে ঠোঁট খুল্‌ল: "আমায় ডেকেছিলেন, কর্ত্তা—"

"ও—হাঁ! তাই তুই এসে বসে আছিস?"

"আজ্ঞে।"

"দ্যাখ ভরত—তোর বোন নাকি এসেছে শুন্‌লুম, বিধবা!"

পেট মুচড়ে উঠল ভরতের, বল্লে: "আজ্ঞে।"

"বাড়ির মেয়েরা কি সব বল্‌ছিল—রজনীর সঙ্গে নাকি—যাক্, তুই এক কাজ কর ভরত—ওকে আবার বিয়ে দিয়ে দে।"

"বিধবার ত বিয়ে হয় না, কর্ত্তা।"

"আলবৎ হয়। দিলেই হয়। তুই ছেলে যোগাড় কর—যা খরচ লাগে নিয়ে যাস্।"

"একবার ভেবেছিলুম কর্ত্তা কবরেজ মশায়কে জিজ্ঞাসা করব—পণ্ডিত মানুষ কি বলেন দেখি!"

"কব্‌রেজ মশাই আবার বলবেন কি?"

"ধামুন মানুষ যদি বিধান দেন—"

"কেন আমি বামুন নই? আমি বিধান দিলে হয় না?"

"আপনিই ত আমার দেবতা—আপনি বল্‌লেই আমাদের সব হয়।"

"তবে আর কি? দেবতার হুকুম যখন, বিয়ে দিয়ে দে।"

কথাটা ভরতের কানে গেল কিনা বলা যায় না। তার সমস্ত শরীরে রজনীর নাম একটা যন্ত্রণার মত কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রজনী তবে পা বাড়িয়েছে তারও বাড়ীতে! বাড়ী যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ভরত।

ভরতকে দেখে দুগ্‌গাই এগিয়ে এল প্রথম: "জমিদার বাড়ী থেকে আমাদের জন্যে কি সিধে নিয়ে এলে দাদা?"

ভরতের শরীরের তাপ ঝাঁৎ করে পড়ে যায়। ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে তার মুখ। অবাক হয়ে দুগ্‌গার দিকে সে চেয়ে থাকে, যেন এই প্রথম মেয়ে মানুষ দেখছে।

"বারে—খালি হাতে বাবা কখনও ফিরে আস্‌ত?"

এমন ছেলেমানুষকে কি বলবে ভরত? একথা নিয়ে বয়স্কের সঙ্গে আলাপ করা যায়, রাগ করা যায়, ধমকাধমকি, হাতাহাতি পর্য্যন্ত চলে। কিন্তু দুগ্‌গাকে কি করে বলা যায় সে কথা? বংশীকে যখন খেলা দেয় দুগ্‌গা, মনে হবে সে বংশীর তিন বছরের বড় বোন—অবুঝ ভাইকে নিয়ে আবোল তাবোল বক্‌ছে। ভরত নিরুপায় হয়ে কাঁধের কাপড়টা দুগ্‌গার হাতে তুলে দিলে।

"কিছুই আনলে না যখন—যাই একটু ঘুরে আসি। জানো

দাদা, চৈতনদার বৌ ভারী মজার কথা বলে। মৈমনসিং-এর মেয়ে, ওদের দেশে নাকি নদী আর বিল মস্ত মস্ত। মৈমনসিং অনেক দূরে, না দাদা?"

কতদূরে কে জানে? ভরতের তা জানবারও দরকার নেই। মুখ গম্ভীর করে ভরত বলে: "কারো বাড়িতে তুই যেতে পাবিনে!"

"কেন?" মুখের হাসি মরে গেল দুগ্‌গার।

"না।"

"না কেন? কি করেছি আমি?" বড় করুণ আর অসহায় দেখায় দুগগার মুখ।

"লোকে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে—"

"কি বল্‌ছে—তাই বলনা!"

"সে তোর বৌঠানকে জিজ্ঞেস কর।" ভরত চেষ্টা করেও লোকের নালিশটা দুগগাকে জানাতে পারে না।

"মিছিমিছি লোকে বানিয়ে কথা বল্‌লেই তুমি শুনবে সে কথা?" জল ঝেঁপে আসে দুগগার চোখে।

ভরত আর ওখানে দাঁড়াতে পারে না। মনটা খারাপ হয়ে যায় তার, কাঁদিয়ে ফেল্‌লে সে মেয়েটাকে? হতে পারে ত তেমন কোনো দোষ দুগগার নেই। সবাই গাঁয়ের লোক, সবার সঙ্গেই সে হেসে ঢঙ্গে কথা বলে। মনে ওর হয়ত কোন পাপ নেই। কিন্তু লোকে ত আর দেখবে না, লোকে দেখবে ওর বয়েস, দেখবে যে ও কাঁচা বিধবা। পাপ কেবল ওকে ছুঁইছুঁই করছে। গা বাঁচাতে হবে খুব সাবধানে। তা করেনা বলেই ত এত সব কথা শুনতে হয় তাকে!

রাত্রিতে সুবর্ণের কাছে ভরতই কথাটা খোলে: "বাবু বলছিলেন রজনী সা-র কথা—দুগগার সঙ্গে ওর কিছু হয়েছে নাকি?"

"আমি কি পাহারায় বসে থাকি?" সুবর্ণ বিরক্ত হয়।

"দুগগাটারও জ্ঞানগম্যি নেই!"

"বুড়ী হয়ে ত বসেনি যে জ্ঞানগম্যি থাকবে—দিয়েছিলে ত এক বুড়োর কাছে বিয়ে—ওর বুঝি সাধআহ্লাদ নেই?" ভরত অবাক হয়, পালে উল্টো হাওয়া লাগতে সুরু করেছে।

"বাবু বলছিলেন ওকে আবার বিয়ে দিয়ে দিতে।"

"রাড়ীকে বিয়ে করবে কে?"

"কেউ যদি করে।"

এ নিয়ে কোনো মত দিতে সুবর্ণ কেমন ভয় পেয়ে যায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে: "বেরিয়ে টেরিয়ে যায় যদি তার চেয়ে বিয়েই ত ভালো—লোকে মস্করা করবে একদিন, রোজ রোজ ত আর এই দুর্ভোগ হবেনা।"

"আচ্ছা, মনে কি হয় দুগ্গা নষ্ট হয়ে যাবে?"

"তোমার বোন তুমিই ভালো জানো।"

"মেয়েদের আমি কি জানি?" ভরতও বিরক্ত হয়ে ওঠে। সুবর্ণের পরামর্শ চায় সে, তার কাছে কাটা-কাটা কথা শুনতে চায় না।

"জানো না ত কথা বলতে এস কেন?" সুবর্ণের গলাও তেতো শোনায়। দুগ্গা সম্বন্ধে সুবর্ণের ভালমন্দ কোন ধারণা এ পর্য্যন্ত মনে দানা বাঁধেনি। ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনছে সুবর্ণ। দুগ্গাকে দেখলেই নাকি রজনী সা চোখ টেপে, ইসারা করে—দুগ্গা নাকি সরে

যায় না, দাঁড়িয়ে থেকে মুখ টিপে হাসে। তাছাড়া রাড়ীর অত ছিম-ছাম থাকা কেন? তাই যদি থাকতে পারবি তবে আর সিন্দুর মুছে যায়? চৈতনের বৌ আরও অনেক কথাই বলেছে সুবর্ণের কাছে। মনমোহনের ছাড়া ভিটেয় একদিন নাকি তুগ্‌গার হাত ধরে টানাটানিও করেছে রজনী। উঠতি বয়েস তুগ্‌গার—একদিন তু'দিন না হয় এড়িয়েই চল্‌ল—কিন্তু এমন ধারা হতে থাকলে কদিন আর সামলে থাকতে পারবে? তুগ্‌গার উপর রাগ হয়না সুবর্ণের। তার মত বয়সই ত তুগগার—ভরতকে নিয়ে এ-ঘরে থাকৃছে সে—রাতের পর রাত কাটাচ্ছে ও-ঘরে একা তুগগা। তুগগার কাছে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় বুঝি সুবর্ণের। তাই রাগ করতে পারে না কোনো কারণেই তার উপর।

"কেলেঙ্কারী হয় তাই ভাবি।" মস্ত ভাবুকের মত বল্‌লে ভরত।

"হুঁ—নিজের বেলা ষোল আনা চাই, আর বোনের কোন ভাবনাই নেই।"

কথাটা ভরতের মাথায় গেলনা। সুবর্ণ খিলখিল করে হেসে উঠল যখন, তখনও সে বোবার মতই চেয়ে রইল। টুনীর কথা শুনেছে নাকি সুবর্ণ? কিন্তু টুনীর সঙ্গে তেমন কিছু ত তার নেই। তুটো একটা আমুদে কথা হয়েছে মাত্র। কি জানি, মেয়েদের যা সন্দেহ-বাতিক!

পরদিন থেকে তুগগা যেন মাটির মানুষ। খাটো ময়লা একটা কাপড় পরে আঁচলটা জড়িয়ে নিলে কোমরে—হাঁকডাক করে বল্‌লে সুবর্ণকে: "ছাইভস্ম যা খুসী রান্না কর তুমি বৌঠান—আমি ধান সেদ্ধ

করব।—রান্নাঘরে অত ধান রাখে নাকি কেউ—কোন দিন আগুন লেগে যাবে সব পুড়ে ছারখার হয়ে!"

উঠোনের প্রকাণ্ড উনুনটায় জল-মাটির ন্যাতা বুলিয়ে আন্‌ল তুগ্‌গা। শুক্‌নো বাঁশের কঞ্চি আর মরা পাতা জড়ো করলো এক রাশ।

হাস্‌তে হাস্‌তেই সুবর্ণ বলে: "আবাগীর কাণ্ড ত্যাখ। কার সেদ্ধ ধানের ভাত খেয়েছিস্ অ্যাদ্দিন?"

"ভাত কি আর খেয়েছি—সব খুদ! খুদ খাইয়ে ত দাদার শরীরের এ অবস্থা করেছ।"

হাঁড়িটা বার করে দিয়ে সুবর্ণ বলে: "নে দাদা-ওয়ালী, কেমন চাল হয় দেখব এবার!"

"জব্দ করবার জন্যে যদি কুটে গুড়ো করে দাও—সে আর আমার কি দোষ?"

"শুধু তাই, শুকোবোই না ধান—ঢেঁকির পাড়ে দেখিস্ সব যদি চিড়ে না হয়!"

শব্দ করে তুজনেই হেসে উঠল। বংশীকে কোলে নিয়ে ভরত বোচনের বাড়ী থেকে এসে দেখে তুজনের এ অবস্থা। খুসীতে গলার শিরাগুলো ফুলে উঠ্‌ল ভরতের। কালকের বিশ্রী দিনটা আজ যে এত পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌বে তা সে ভাবতে পারেনি। খুশী হতে বা খুশী থাক্‌তে বেশী কিছু দরকার হয় না তার। ঘরে ধান আর এদের মুখে হাসি! তাতেই ভরতের ফুসফুসটা হাওয়ায় ফুলে ওঠে—মাটির উপর ফুরফুর করে হাঁটতে পারে সে।

বংশীকে নামিয়ে দিয়ে দু'আনা পয়সা কোমরে গুঁজে নেয় ভরত। তারপর গামছাটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে বাজারের পথ ধরে। মনটা এত ভালো আজ—চার পয়সার মাছ না কিন্‌লে চলে না। এক পয়সার পান সুপুরিও আনতে হবে—দুগ্‌গা পান খায়। পান খেলে সুবর্ণকেও এত ভাল দেখায়—ডগডগে লাল হয়ে ওঠে তার ঠোঁট!—লাল হবে না, ওর ওপর ভরতের কি যে-সে টান!

পীতাম্বরের দোকানে এসে হুঁকোটার জন্যে হাত বাড়িয়ে ভরত বলে: "চার পয়সার মাছ ছাখো পীতাম্বরদা—বাঁচব আর আম্মিরা?"

"মাছও কিন্‌তে সুরু করেছিস, তবু বলিস্ বাঁচ্‌বিনে?"

লজ্জায় পড়ে ভরত। "বিলে যেতে পারছিনে—জালও নেই। ছিদ্দকও ওর জাল মেরামত করছে।"

"নাঃ—দামের কথা আর বলিস্‌নে। নতুন নতুন বাবু গজিয়ে উঠ্‌ছে—কই মাছ একটা এক পয়সা দিয়েও কিনে খায়।"

"এক পয়সা একটা কই মাছ?" ভরতের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

"বলিস্ কেন! দুধ? চার পয়সা সের বিকোচ্ছে—ওই ছাখ সা-র গদীতে কেনা হচ্ছে। দু পয়সা—বড় জোর, আড়াই পয়সা সেরই ত জন্মভর দেখে এলাম!"

দুধের জন্যে ভরতের কোন আশঙ্কা নেই। তবু একবার গদীর দিকে চোখ ফেরায়। লোকের ভীড় গদীতে—শুধু এ গাঁয়েরই নয়, কাছাকাছি গাঁয়ের অনেক লোকই রাজচন্দ্র সা-র গদীর নাম জানে—শুধু কেনাকাটি নয়—বেচতেও আসে অনেকে—বেচতে আসে, আজন্ম যে ভাত জুগিয়ে এসেছে তাকে—সেই মাটিকেও।

"গদীতে গোরামত লোকটা কে, পীতাম্বরদা ?"

পানের গোছ তৈরী করতে করতে পীতাম্বর বলে: "হাতে সোনার পাটা ত ?"

"হ্যাঁ।"

"রজনী-সা।"

রজনী সা! ভরতের চোয়ালটা শক্ত হয়ে আসে। যাকে সে অনেক রকমে জানে আজই প্রথম দেখল তাকে। দেখবার উৎসাহ তার মোটেও ছিল না, বরং যাতে দেখা না হয় মনে মনে ভরত তাই চেয়েছে। চেহারা ভালো রজনীর। গোলগাল, ফর্সা। ধুতি ফতুয়াও ধোলাই করা। বয়েস বড় জোর আটাশ। বিয়ে করেছে নিশ্চয়। বউও হয়ত সুন্দর। তবু লোকের বাড়ীর আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মারে কেন লোকটা? রাগের চেয়ে অবাকই হয় ভরত বেশী।

"অ্যাদ্দিন রজনী সা-কে দেখিস্‌নি তুই ?"

"এক পয়সার পান সুপরি দাও পীতাম্বরদা।" এতক্ষণে যেন ভরতের হুঁস হল, রজনী সা-র সব খবরই যখন পীতাম্বর রাখে—দুগ্‌গার খবরটাও হয়ত শুন্‌তে তার বাকি নেই!

ষ্টেশনের ঘাটে এসে লাগ্‌ল নৌকো। লগিটা মাটিতে কুপতে চেষ্টা করছিল ভরত। ছিদ্দিক এগিয়ে এল। ভরতের হাত থেকে লগিটা তুলে নিয়ে জলের নীচে এঁটেল মাটিতে ঠুকতে সুরু করল

ছিদ্দিক। তারপর সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল যখন লগি, পাটাতনের তলা থেকে একটা দড়ি বার করে জড়িয়ে দিলে লগির গায়ে। আর কোনো কাজ নেই এখন। গাড়ির জন্যে চুপচাপ বসে থাকা—দেড় ঘণ্টা।

"ভালো করে একছিলিম তামুক খেয়ে নে, ভরত—"

"হাঁ, যাবার আগে দু'জনে বসে তামুকই খেয়ে যাই।"

"আজই বাগানে যাবি কি করে? রাত হয়ে যাবে যে।"

"ষ্টেশনের টুলের উপরই ঘুমিয়ে নোব রাতটা—তারপর কাল সকালে রওনা হব—দণ্ডেক হাঁটতে হবে।"

পাহাড়টা অনেক কাছে মনে হয়। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যাবে। স্যাওড়ার চারার মত ছোট ছোট গাছ দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে—ওরা কিন্তু বড় বড় সল্লা আর শিরীষ গাছ। ছিদ্দিক পাহাড়ের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস টেনে নেয়।

খালের মাথায় পদ্মপুকুরের গা ঘেঁসে পাট পচাই সুরু হয়ে গেছে। প্যাকাটি থেকে আঁশ ছাড়িয়ে গোছা করে জলের উপর আছড়ে নিচ্ছে দু'চার জন লোক। কাপড়ের মত নিংড়ে শেষে গোছাগুলো ছুঁড়ে ফেল্‌ছে ডাঙ্গায়। কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে ভরত তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে—এখনো পাট করে লোক? রোজ গাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বড় করে তোলে তাদের—কেটে মাচা করে জলে ডুবিয়ে রাখে এখনো? তারপর ওম্নি আড় বাঁশে ঝুলিয়ে শুকোয় পাট? পাটের সেই পচা, সুন্দর গন্ধটা যেন নাকে এসে লাগে ভরতের। ঠোঁট থেকে সরু হয়ে বাতাসের নাল বেরিয়ে আসে না আর টিকের

গায়ে। দুহাতে ভরত অনুভব করতে থাকে গোছা গোছা পাটের নরম ঝাপ্‌সা স্পর্শ।

ভরত নৌকো পাবে কোথায়? ছিদ্দিকের নৌকোতেই কিছু কিছু করে পাট বাড়ি নিয়ে আসে—আবার যেতে হয় বিলে—মাচাশুদ্ধ কেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল কিনা নজর রাখতে হবে। একটা জন নিয়ে ছিল ভরত একদিন—কুঁড়ের বাদশা—পাঁচ সের পাট তুলেই হাঁপাতে থাকে! ছিদ্দিকেরও নৌকোর দরকার—নইলে একদিনে একাই ভরত সব পাট তুলে ফেল্‌তে পারত। রসিক নিস্কেরাস্কাল হয়ে গেছে, একটা কুটো পর্য্যন্ত তার আর বিলে পড়ে নেই। ছিদ্দিকেরও হয়ে এল। বোচন ত কবেই সাফ। ভরত যেন থই পাচ্ছে না। আগ্রহও তার বেশি, কাজও এগোয় না। ব্যাপারী এসে বসে আছে বাজারে। কেনা-বেচা সুরু হয়নি, তবে সুরু করলেই হল। বাড়িটাকে মনে হয় ভরতের শুধু একটা পাটের আড়ত। সেখানে যে কতগুলো মানুষ আছে—আছে তার সুবর্ণ আর বংশী, আছে দুগ্‌গা—সে কথাও আর মনে নেই তার। কোথা দিয়ে যে সূর্য্য আসে, সূর্য্য যায় তার খবর পর্য্যন্ত রাখে না সে। তবু সূর্য্য ভরতের পাট শুকিয়ে দিয়ে যায়—মেঘ করে এলে সুবর্ণই সামলায় রাশি রাশি পাটের গোছা। মাঝে মাঝে দুগ্‌গাও আসে সাহায্য করতে।

নাগাড়ে তিনদিন রোদ দিয়েই আকাশ কালো করে মেঘ এল।

দুরন্ত বৃষ্টি আর দারুণ তুফান। ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ায় কার সাধ্য? আকাশের চেয়েও বেশি কালো মুখ করে ভরত এই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরুতে চেয়েছিল—তার সব পাটই যে বিলে পড়ে আছে—জীবনের চেয়ে তার দাম কিছু কম নয়। সুবর্ণ তা শুনলে না। এমন কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলে যার পর কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে মাচার উপর এসে না বসে ভরত পারল না। ডাকহাঁক করে সুবর্ণ জিজ্ঞেস করল দুগ্‌গা ঘরে আছে কিনা। সাড়া পাওয়া গেলনা। সুবর্ণের গলা গিয়ে পৌঁছল কি না কে বল্‌বে? ঘরে থেকেই ভয় করছিল সুবর্ণের—খুঁটিগুলো এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে। ভয়ে সে বংশীকে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখে।

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—" কান্নার মতই ভরতের সুর।

"ঘরবাড়ি আগে থাক্ ত, পাটের কথা পরে ভেবো।"

"তিন মণ পাটও যে তোলা হয়নি!"

"না-ই বা হল—বিলে আছে ত।'

"আছে! এ ঝড়ে থাক্‌বে কিছু?"

"থাক্‌বে—দেখো, ঝড়ে কি হবে? খোঁটা দেওয়া আছে ত!"

ঝড়টাকে খাটো করে দেখবার মত কোন যুক্তিই খুঁজে পায়না ভরত। ভাবতে শুরু করে আগামী দিনের কথা। বারো টাকা দর পেলেও ছত্রিশটা টাকা মাত্র পাওয়া যাবে—এই ছত্রিশ টাকায় সমস্ত বছর কি করে চলবে তার? পাট করে আমনও পেলনা সে—আউসের দিন আসতে এক বছর। সমস্ত শরীরে আগুন ছিটিয়ে দেয় যেন ভরতের। গা থেকে সে কাঁথাটা ছুঁড়ে ফ্যালে।

বিকেলের দিকেই ধরে এল বৃষ্টি। ভরত কেবল দেবতার নাম জপছিল। বাতাসও পড়ে এল খানিকটা। এবার আর কে তাকে ঘরে রাখবে? জোংরাটা মাথায় চড়িয়ে ঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ভরত। সুবর্ণকে হাঁ করবারও সময় দিলেনা।

ছিদ্দিক হাসতে লাগল ভরতের কথা শুনে: "পাটের মাচা তোর জলের নীচে—জলের ভেতরে হাওয়া সেঁধোয় কখনো?"

চোখ খাড়া করে ভরত বলে: "সোঁতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ত!"

"তাতে আর কদ্দূর যাবে?"

"তবু একবার দেখবনা ছিদ্দিক?"

ছেলেমানুষ যেন বায়না ধরেছে। বায়না রাখতেই হবে—ছিদ্দিক নৌকোটা বার করে আনে। বিলে পৌঁছবার আগেই ভরতের তালু শুকিয়ে গেল। গিয়ে যা দেখবে তা যেন একরকম ওর জানারই মধ্যে। এখন কেবল দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া বাকি। যেন সে মরাকান্না কাঁদতে যাচ্ছে—মরাটা দেখবামাত্রই ডুকরে উঠবে।

"কোথায় কি—দেখত! ভেজানো পাট তুফানে নষ্ট হয় কখনো?" ছিদ্দিক পাটের বাঁধে লগির গুঁতো দিয়ে বলে।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না ভরত। অসহ্য আনন্দ চেপে রেখে শুধু বললে: "নষ্ট হয়ে যেতে পারত কিন্তু—"

বাঁধ ছিঁড়ে গিয়ে কিছু পাট ভেসে গিয়েছিল—তা খুবই সামান্য। ওতে আর নজর দেবার দরকার ছিল না ভরতের। ছিদ্দিক লাফ দিয়ে মাচাতে গিয়ে পড়ে বলল—"লগি দিয়ে তুই টেনে দে ভরত ওগুলো, আমি বেঁধে ফেলি।"

"ও থাক—চলে আয় তুই ছিদ্দিক।" ওটুকুর মায়া ছাড়তে ভরতের আর আপত্তি নেই।

"থাক্‌বে!" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ছিদ্দিক: "তুই ত বল্‌বিই, চাষীর ছেলে ত নোস্!"

চাষীরা ঘুরে ঘুরে যায়—ব্যাপারী এতদিনে মুখ খুলেছে। ছ'টাকা দর। একটি আধলা বাড়বেনা। দিতে হয় দিয়ে যাও। গোড়ায় তবু এ দর দিচ্ছি—রকম যা দেখা যায় দর বরং পড়ে যাবে।

ধান যাদের ফুরিয়েছে এ দরেই তারা এগিয়ে এল। গোপনে সন্ধ্যার পর কেনা-বেচা চল্‌ছিল।

চৈতন বলে: "ব্যাপারী, ঠকিয়ে নিলে কিন্তু এবারে খুব।"

দু'হাতে কিস্তী টুপিটা আলগোছে ধরে তাতে ফুঁ দিয়ে বলে সৈয়দ মিয়া: "দাম আরো পড়বে মাঝির পো—এ আর কি পাট করেছ তোমরা—মৈমনসিং সফেদ হয়ে গেছে।"

"আমরা বলেই দিলাম—যাদের বেশী আছে তারা ছাড়বে না বলে দিচ্ছি।"

সৈয়দ জবাব দেয় না। টুপিটা মাথায় চড়িয়ে গোঁফদাড়ির উপর একবার হাতটা বুলিয়ে নিয়ে আসে। ঠোঁট দুটো হাসিতে বেঁকে যায় একটু। কুপীর আলোতে সে মুখটা ভীষণ দেখা যায়।

চৈতন দাঁড়ায় না। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা টাকাগুলো যেন তার চোরাই মাল এম্নি আশঙ্কা মুখে নিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়।

এম্নি অনেকেই আসে। হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানায় সৈয়দ,

হাসি দিয়ে বিদায় দেয়। দর যেমি কম কথাও কয় কম। অনেক সুখ দুঃখের কথা শোনে সৈয়দ চাষীদের মুখে। আর নিষ্ঠুর বিধাতার মত তার বিচার নেমে আসে—ছ'টাকা মণ। দিনের পর দিন একই ভঙ্গী—একটু তার ব্যতিক্রম নেই।

তারপর একদিন বাজার থেকে আরো দুঃসংবাদ আসে। সৈয়দ মিয়া পাঁচ টাকার বেশি দিতে চায় না দর। কুটির বাজারে বেচা হচ্ছে সওয়া পাঁচ টাকা দরে। চার আনা বেশী পেতে হয় ত যাক্ চাষীরা নৌকা করে বারো মাইল!

ছিদ্দিকের বাড়ির বটগাছটার নীচে চ্যাটাইর উপর জটলা বসে।

"আঠারো টাকা থেকে পাঁচ টাকা নেমে যায় কখনো দর—হাঁ রে ছিদ্দিক—" চোখে তরাস নিয়ে ভরত জিজ্ঞাসা করে।

"ঠকিয়ে মারতে এসেছে সৈয়দ মিয়া—" রসিক রাগে ফেটে পড়তে চায়।

ছিদ্দিকের কপালে চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দরের কি জানে সে? কি উত্তর দেবে? তার নিজের অবস্থাও এদেরই মত। তবে দুকাণি ক্ষেতে ধান করেছিল সে, কটা মাস তাই ভাত পাবে। ছিদ্দিক চুপ করেই থাকে।

ছিদ্দিকের চুপ করে থাকাটা বিশ্রী মনে হয় রসিকের কাছে। সৈয়দের সঙ্গে ওর নিশ্চয় সাট আছে। দু'জনেই এক জাত—মুসলমান। কে বলবে—তলে তলে হয়ত ছিদ্দিক বেশি দামে সৈয়দের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে পাট। সৈয়দের পাঁচ টাকা দর শুধু হিন্দু চাষীদের মারবার জন্যে।

"এখন বেচবনা, কি বলিস ছিদ্দিক ?" আকুল হয়ে ভরত ছিদ্দিকের দিকে তাকায়।

"রেখে দিতে ত পারি—তবে আরও যদি পড়ে যায় দর ? ছ'টাকা ত ছিল দর এখন পাঁচ টাকা। বেচা হচ্ছে পাঁচ টাকাতেই !"

"না বেচে করব কি ? খাবো কি ? পাট চিবিয়ে ত পেট ভরবে না !" রসিক বলে।

"বেচতে সুরু করেছিস না কি তুই ?" ছিদ্দিক জিজ্ঞাসা করে।

"করিনি। কিন্তু কাল মণ খানেক না ছাড়লে হাঁড়ি চড়বে না।"

"দিন দশেক ধরে রেখে দেখবো আমি।"

লোক-দেখানো ধরে রাখতে আর আপত্তি কি, রসিক ভাবে। যতদিন খুসী মুখে বললেই হল বেচব না পাট। গোপনে যখন বেচা-ই হচ্ছে মুখে যা খুসী বলুক না। পাগলের মত হয়ে উঠল রসিক—রাগটা খোলসা করবার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিল না তাই।

"তাহলে আমিও ধরে রাখি, কেমন ছিদ্দিক ?" অন্ধকারে যেন ভরত পথ হারিয়ে ফেলেছে—সে অন্ধকারে পথ জানা আছে শুধু ছিদ্দিকের—তার পেছনে চলা ছাড়া ভরতের আর উপায় নেই।

"রেখে দে খোদার নামে। যা-হয় হবে। সৈয়দ মিয়া চালাকি করছে কি না তাত বুঝতে পারবো দুদিন বাদে !"

"দুদিন বাদে আর কেন ? এখনি বুঝতে পারিস্ না—তোদের জাতই ত সৈয়দ—" রসিদ মুখটা বিস্বাদ করে তুল্‌ল।

"হেঁ সৈয়দ ত আমার সম্বুন্ধি কি না—" ছিদ্দিকের মেজাজও বেতর হয়ে উঠল।

ভরত অস্থির হয়ে ওঠে। এ বিপদে আবার কেউ ঝগড়াঝাটি করে না কি? সব সময়েই রসিক চাড়ালের ঘাড়ের রগটা বাঁকা হয়ে থাকবে। বাঁকা কথা বলা চাই-ই তার!

রসিক আর বসে না। এখানে থাকলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত হাতাহাতিই করতে হবে। ছিদ্দিক তামাক সাজতে লেগে যায়।

"দর উঠবে—না ছিদ্দিক?" আস্তে আস্তে বলে ভরত!

"সৈয়দ মিয়ার হালচাল সুবিধের নয়।"

"দর দিচ্ছে না কেন এবার?"

"সবাই পাট করেছে—সবাই হাঁ করে আছে বেচবার জন্যে, তাতেই ওর গুমোর বেড়েছে।"

"ছিদ্দিক—" কাছে-বসা ছিদ্দিককেই ভরত এম্নি ভাবে ডাকে যেন সে ভয় পেয়েছে।

"কেন রে?"

"আমার ভাই এক রত্তি ধান নেই ঘরে।"

"দিন দশ বারো চালাতে পারবি নে?"

"নাঃ—"

"তাহলে কি আর করবি! টাকা নিয়ে নে।"

"পাট বেচে দোব?"

"না না। রজনী সা-র কাছ থেকে নিয়ে নে না পঁচিশটা টাকা!"

"ধার? খতে টিপ দিয়ে?"

"তাতে কি? আঙ্গুল ত আর ক্ষয়ে যাবে না! একমাসের কড়ারে নিয়ে নে!"

"তুই যাবি ত সঙ্গে ?"

ছিদ্দিক হেসে ফেলে বলে : "তা না-হয় যাব !"

রজনী সা-র গদি থেকে যখন বেরিয়ে এল ভরত, মনে হল বাড়ি ঘরদোর, জমিজমা যেন আর তার কিছু নেই। শুধু পঁচিশটা টাকা তার খুঁটে বাঁধা—সেই তার সব, এতদিনের পরিশ্রম আর বাকি জীবনের পুঁজি ! রজনী সা অবিশ্যি খুব মিষ্টি কথা বল্‌লে। বল্‌লে, সবাই যখন গাঁয়েই থাকি আমাদের সুখ দুঃখ ত সমান। টাকা তার আছে কিন্তু গাঁয়ের লোকের কাজে যদি না লাগে টাকা—তবে সে টাকার কি মানে হয়—শিবরাম রায়ের মতই কথা বল্‌লে রজনী সা। যখন যত টাকার দরকার হবে ভরতের, সে যেন আসতে একটুও ইতস্তত না করে। লোকটাকে খুব খারাপ মনে হলনা ভরতের—বরং মনে হল ভালো লোক। ওর উপর যে ভরতের একটা আক্রোশ ছিল তার জন্য এখন সে লজ্জিতই হচ্ছে। মানুষের কাছে না গেলে মানুষকে বোঝা যায় না। কিন্তু খতে তাকে টিপ দিতে হলই। সেই ভয় আর আশঙ্কাই বুকটাকে তার কুরে কুরে খাচ্ছিল। এ ধার আর ছিদ্দিকের কাছ থেকে আট গণ্ডা দশ গণ্ডা পয়সা নেওয়া নয়—তার সুদ দিতে হবে মাস গেলে দু টাকা—রজনী সা-র ধারাল টাকা এ—রজরী সা, যার ব্যবসাই টাকা ধার দেওয়া !

পাটের গন্ধে বাড়ীটা ম-ম করছে—নিশ্বাস নিতে আগে খুবই ভাল লাগত ভরতের ! এখন যেন দম আটকে আসে ! ত্রিশ মণ পাট যেন চেপে আছে তার উপর, সুবর্ণ আর বংশীর উপর।

দেবতারা উপর থেকে তাকে মারবার এই ফিকিরই করেছেন যেন।

দুগ্‌গা আছে বেশ। আবার একটু ফর্‌ফরে হয়ে উঠেছে। ক'টা মাস বাড়ি থেকে একটা পা-ও বাড়ায়নি বাইরে—সুবর্ণের সঙ্গে বেদম খেটে গেছে। ঘাটে বসে এখন সে কাপড় কাচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নীল লাগিয়ে শুকোয় কাপড়। ফর্সা কাপড়টা ওর কালো পুষ্ট শরীরে জড়িয়ে থেকে আরো ফর্সা দেখায়। কপালে কাচপোকার টিপ, মুখে ফিকে হলুদ ছাপ। তেল-হলুদ মাখে কি না মুখে কে বল্‌বে? অযোধ্যার বাড়ি যায়—বুচির খিলখিল হাসির সঙ্গে দুগ্‌গার হাসির শব্দটাও শোনা যায় দূর থেকে।

মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল ভরতের। ঘরে ঢুকে মাচার উপর সে গা এলিয়ে দেয়। ভাবে, চোখ বুঁজে শুয়ে থাকবে কতক্ষণ—ঘুম যদি আসে ভালই।

চৈতনের বৌ এসেছে—দুগ্‌গার কাছেই। সুবর্ণও জুটে গেল গল্পে।

"পটের বিবিটি সেজেছিস দুগ্‌গা—সায়েব আস্‌বে না কি শুনতে পাই!" মোটা দানাদার গলায় বলে চৈতনের বৌ।

"মর্‌ মাগী—তোদের দেশেই বৌঝিদের সায়েব লাগে!" সুবর্ণ রসিকতা করে।

"হাঁ রে দুগ্‌গা যা শুন্‌ছি সত্যি?" চৈতনের বৌ অল্প ঝাঁক নেয়।

"কি?" একটু বিরক্ত হয়েই বলে দুগ্‌গা।

"রেতে না কি বাবুর বাড়ীতে যায় বুচি—ছি ছি বেহায়া মেয়ে

আরো কতই যে করবে—তারিণী ঠাকুর এখন বাবুর বাড়ীর কর্ত্তা কি না!"

"সে আমি কি জানি, জিজ্ঞেস করলেই পারিস তুই—"

"এ কি বুচিকে জিজ্ঞেস করা যায়—বল ত বৌঠান?"

সুবর্ণ বংশীর চুলের জট খুলতে খুলতে মাই দিচ্ছিল তাকে। মুখ না তুলেই হেসে বললে: "পরের খবরে কি করবি হারামজাদি—নিজের সোয়ামীকে আগলাস, বুচি আবার না ভাগ বসায় দেখিস্।"

"বসাক্—আমার ক্ষেতি নেই!"

"কেন রে?" দুগ্‌গা ফোঁস করে উঠে: "আছে বুঝি তোরও আর কেউ?"

"এ পোড়াকাঠের দিকে আর কে চাইবে বল্, তোদের মত রূপসী থাকতে!" চৈতনের বউও কম যায় না।

"রূপ থাকলেই ভূতে নজর দেয়—রূপসীরা কি করবে বল্!" সুবর্ণ ননদের পক্ষ টানে।

"হ্যাঁ দিদি জানিস্—" চৈতনের বউ আবার লাফিয়ে উঠে: "টুনীকে ভূতে পেয়েছে!"

"অ্যাঁ—" সুবর্ণ মুখ তুলে অবাক হয়ে চায়।

"মাতাল বদমাস মানুষের কাছে বিয়ে দিলে অম্নি ভূতে পায়।" নাকটা একটু ফুলে ওঠে দুগ্‌গার।

"হ্যাঁ দিদি—শীতল-বুড়ো মানুষ নয়—হাত ভরে কতগুলো টাকা পেয়ে টুনীকে ও লোকটার কাছে বিয়ে দিয়েছিল—ঘরে থাকে না

নাকি একরত্তি, বাজারেই পড়ে থাকে। বাজারের মাগীগুলোকে ধরে ধরে বাড়ী নিয়ে আসে পর্য্যন্ত—ছিঃ ছিঃ!"

"তা হলে সমানে-সমানে পড়েছে বল্—যে মুখ বাবা টুনীর!" সুবর্ণ মুখ বাঁকায়।

"জামাই আর নেবে না টুনীকে—দিয়ে গেছে বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে।"

"এখন ভূতের ব্যাগার খাটুক বুড়ো—" ঠোঁট টিপে বলে দুগ্‌গা।

"ছেলেটা কি হল? ছেলে হয়েছিল শুনেছিলাম।" বংশীর মাথা ছেড়ে, চুল টেনে টেনে নিজের মাথারই উকুন আন্‌তে সুরু করে সুবর্ণ।

"মরে গেছে বুঝি!" চৈতনের বউ-এর কথার তোড় কমে আসে। ঘটনাটায় দুগ্‌গা বা সুবর্ণ কেউ বেশি উৎসাহ দেখায় না—অথচ এ নিয়ে কত হাসি-ঢং-এর কথাই না হতে পারত! চৈতনের বউ হয়ত একটু মন খারাপ করে ফেলে।

ঘুম আস্‌ছিলনা ভরতের। এ সময় ঘুম আসবার কথাও নয়। তবু হয়ত চোখ বুঁজে আসত কোনো সময় কিন্তু এদের কথায় আর হাসিতে তা-ও হল না। কানে আস্‌ছিল তার এদের কথাগুলো! খাওয়া পরার দুশ্চিন্তার উপর যেন ওগুলো হোঁচট খেয়ে পড়ছিল। দুগগার বিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু ও-ত জানায় না এমন ইচ্ছা কোনো সময়। এমন কি সুবর্ণের কাছেও টুঁ শব্দটি করে না। ও কি নষ্ট হয়ে যাবে—নষ্ট হয়ে গেছে? যদি তা-ই হয়, কি করতে পারে ভরত? করতে পারে না সত্যি—কিন্তু গাঁয়ে সে মুখ দেখাবে কি করে? তারপর আসে টুনী। বিয়ে হয়েছিল মেয়েটার ন'মাস

হবে—তাতে আবার ছেলেও হয়েছিল না কি? এমন তেজী আর ভাল মেয়েটাকে বেচে দিল শীতল একটা হারামাদের কাছে? শীতলেরও বা দোষ কি, হয়ত ভেবেছে না খেয়ে আর মেয়েটা মরবে না! ফেঁসে-যাওয়া কালো কুটকুটে চাদরটা গায়ে দেখ্‌লেই বোঝা যায় কি অভাব শীতলের! বাচ্চা থেকে গাইটাকে লায়েক করে এনে এক ফোঁটা দুধ খেলেনা একদিন—বাছুর শুদ্ধ বেচে দিলে!

ভরত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে ছুটে পালাল চৈতনের বৌ অথচ তার জিভ কাটাটা দেখ্‌তে ভরতের বাকি রইল না।

"পাটের দর নেই।" ভরতের ইচ্ছা স্বর্ণ ই কথাটা শুনুক।

"এত খেটে পাট তুল্‌লে—দর পাবে না?" দুগ্‌গাই উদ্বিগ্ন হল বেশি।

"তোরাও ত কম খাটিস্‌নি—খাটুনির দাম ব্যাপারী বোঝে না!"

"মানুষের দাম বোঝে না—" সঙ্গে সঙ্গেই বলে দুগ্‌গা।

"দিয়েছে পঁচিশটা টাকা—আগাম। আন্‌লুম, না বেচে ত উপায় নেই।" নিজেকেই হয়ত ফাঁকি দিতে চাইল ভরত—পাট বেচেই ক'দিন পর যখন সে রজনীকে টাকা দিয়ে দিচ্ছে, তখন আর একে পাটের টাকা বল্‌তে দোষ কি?

"তিনটে ত মুখ তাতেই তোমার চিন্তা?" স্বর্ণ এতক্ষণে কথা বললে: "যা দর দেবে তাতে কুলিয়ে যাবে আমাদের।"

"তোমার কোনো হিসেবই ঠিক হয় না—চোখে ত হামেসাই দু'গুণ দ্যাখো তুমি!"

"তোমার উপোসের ধাঁধাঁ দেখার চাইতে তা ঢের ভালো।" মুখ টিপে হাস্‌তে থাকে সুবর্ণ।

এ হাসির উপর আর কথা চলে না শুধু রাগ করা চলে। কিন্তু সুবর্ণের উপর রাগ করতে পারে না ভরত তাই মাথা চুলকোতে থাকে।

শীতল মহাপুরুত হাঁটু দুটোকে হাতের বেড়ে চেপে দাওয়ায় বসেছিল। কাঁচাপাকা দাড়ির খোঁচায় মুখটা তার গম্ভীরের চেয়েও ময়লা দেখায় বেশি। ভরত এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: "কেমন আছ, শীতল মামা?" শীতল যেন এ-প্রশ্নটার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল: "আর আছি! বসে বসে পাগল পাহারা দিচ্ছি আর কি?"

ভরতের চোখ নরম হয়ে আসে: "হাঁ আমিও শুন্‌লাম টুনীর কথা! পাগল হয়ে গেছে একেবারে?"

"পেত্নীতে ভর করেছে! নইলে শুনেছিস আঁতুড় ঘরে ছেলেকে গলা টিপে মারতে?"

ঘরেই কোথায় ছিল টুনী। বেরিয়ে এল। "পাগল, পেত্নী সব আমি—বুঝ্‌লে ভরতদা?" অদ্ভুত চোখে ভরতের দিকে চেয়ে থাকে টুনী।

শীতল উঠে দাঁড়ায়। তারপর ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়।

"না না আমি ত তোকে পাগল বল্‌ছিনে—" টুনীকে ঠাণ্ডা করতে চায় ভরত।

"কেন? বল। তাতে আমার কিছু বলার নেই! মদ গিলে এসে লাথি মেরে যদি সোয়ামি সাত মাসে পেটের ছেলে বার করে দেয় তারপর আমাকে পাগল না বল্‌লে চল্‌বে কেন?"

টুনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ভরত খানিকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলে: "শীতল মামা বল্‌লে ছেলেকে তুই মেরে ফেলেছিস!"

"ও ছেলে থেকে আমার কি লাভ? মাতালের ছেলে মাতালই হত!"

সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি খায় যেন ভরত। সাধে আর লোকে বলে ওকে ভূতে পেয়েছে! দেখ্‌তে ঠিক ভালমানুষ কিন্তু কি ভীষণ কাজ যে ও করতে পারে মানুষের ধারণায় তা আসে না।

"তুমি ভাল আছ ভরতদা? বৌঠানের আর কিছু হল না বুঝি? দুগ্‌গা না কি এসেছে—যাব একদিন।" টুনী সুন্দরমত একটু একটু হাস্‌তে থাকে।

এ সব কথারও উত্তর খুঁজে পায়না ভরত।

"সবাই ত পাট করেছে এবার—তুমিও করেছ বুঝি? অনেক টাকা পাবে, না?" খুসীতে আরো সুন্দর দেখায় টুনীর মুখ।

হঠাৎ মনে হয় সুবর্ণের চেয়েও টুনী সুন্দর। গোলগাল শরীর— আগের চেয়ে একটু ফর্সা হয়েছে যেন। টুনীর উদোম, পালিশ পিঠটার দিকে চেয়ে ভরত ভাবে হয়ত সত্যি টুনীর জামাই লোক ভাল নয়।

"কথা বল্‌ছনা যে, পাগলের সঙ্গে কথা বল্‌বে না বুঝি?"

"দূর—তাই বুঝি!" জোর করে হাস্‌তে চায় ভরত!

"তবে ?"

"পাটের কথা বল্‌ছিলি কি না—তাই ভাবছিলুম। পাটের দর হল না এবারে।"

"কেন ?"

"কি জানি ব্যাপারী বল্‌ছিল দর হবে না !"

"ব্যাপারী বল্‌লেই হল ?"

"কুটির বাজারে দর উঠ্‌ছেনা—যারা গিয়েছিল ফিরে এসেছে !"

টুনী চুপ করে যায়। চোখে একটা ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে-ছায়া বুলিয়ে ভরতের সুবদ্ধ শরীরটা ঠাণ্ডা করে দিতে চায়। শীতল এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। হুঁকোটা ভরতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ধরা গলায় বলে: "মাঝে মাঝে আসিস্‌ ভরত—বড্ড একা থাকি।"

ছিদ্দিকের কথায় ছিদ্দিক-ভরত দুজনেই ডুবল। বারোদিন পরে সাড়ে তিন টাকা দরে বেচে দিতে হল পাট। ব্যাপারী চলে যাচ্ছিল কেনাকাটি ইস্তফা দিয়ে—একরকম সেধেই তাকে ওদের পাট-টা গছিয়ে দেওয়া হল।

রসিক বল্‌ছিল: "ও সব চালাকি ছিদ্দিকের ! ওর পাঠ ছিল না কি মনে করেছিস্‌—আগে সব বেচে দিয়েছিল। মাঝখান থেকে তুই মারা পড়লি, ভরত !"

"তা কেন ? এক সঙ্গেই ত বেচলাম পাট। বরাতে নেই সে-কথা বল্‌। আমি ত তবু চুপ করে গেলুম—ছিদ্দিকের চোখের জল পড়ছিল।"

"মায়াকান্না—তুই বুঝ্‌বিনে।"

"যাক গে। পাট ত খুবই হল—খাবো কি এখন বল্‌ত রসিক।"

"পাটের মুথা ক্ষেত থেকে তুলে তাই সেদ্ধ করে খাও। চাল আর কিনে খেতে হবে না—দ্বুগুণ দর উঠেছে।"

খবরটা ভরতের কাছে নূতন। অস্থির হয়ে সে বল্‌লে: "বাঃ, পাটের দর দিলে না আর চালের দর বেড়ে গেল!"

"ভাগ্যে উপোস থাক্‌লে কে খণ্ডাবে বল্‌!"

"তাই।" কলের পুতুলের মত মাথা নাড়তে থাকে ভরত। তারপর বলে: "তুই ত তবু পাঁচ টাকা দর পেয়েছিস্‌।"

"পেলে কি হবে! ঘরে ত মুখ বেড়েই চলেছে। রাইয়ারও একটা ছেলে হল সেদিন।"

"বিয়ে দিয়েছিস—ছেলে হবে না?" আন্‌মনা থেকেই ভরত একটা জবাব দিয়ে দেয়!

"তাই ত দেখ্‌ছি—কাচ্চাবাচ্চায় ভরে গেছে গাঁ—"

"কিন্তু তোর উপরে কেউ যায় নি—" একটা ধারাল ঠাট্টাও করে ফেলে ভরত।

রসিক প্রথমটায় একটু লজ্জা পায় তারপর বৌএর উপর একটা বিশ্রী ইঙ্গিত দিয়ে চুপ করে থাকে।

বাড়ি ফিরে ভরত শোনে রজনী সা এসেছিল। ভয়ে ভরতের মুখ শুকিয়ে যায়। ধারের কথা যদি কিছু বলে গিয়ে থাকে রজনী সুবর্ণের কাছে, সে আর তবে মুখ দেখাতে পারবে না। ধারটাকে ভরত পাটের আগাম বলে চালিয়েছে। ভাবছিল সে এ মিথ্যাটা না

বল্‌লেও হত! কিন্তু কে তখন জান্‌ত যে রজনী এসে বাড়িতে উপস্থিত হবে! টাকার ব্যাপারে কি হুঁসিয়ার লোকটা! পাট-বেচার কথা হয়ত শুন্‌তে পেয়েছে কারু কাছে—তাই দেখা দিয়ে ধারের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে গেল!

"কথা বল্‌লাম, কি করব!" সুবর্ণ বলে।

"ও কিছু বল্‌লে?" অন্য দিকে চেয়ে ভরত জিজ্ঞাসা করে।

"হেঁ—গল্প জুড়ে দিলে—উঠ্‌তে কি চায় আপদ! দুগ্‌গাও বাড়ি নেই—কি করব, কথার উত্তর না দিলে কি ভাববে!"

"গল্পই করলে শুধু?"

"তা কেন? কি খাই কি পরি—খুঁটে খুঁটে সব কথা জিজ্ঞেস করলে—কত দরদ—কত দিনের কুটুম যেন!"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? কোত্থেকে দুগ্‌গাও এসে হাজির—মুচ্‌কি একটু হেসে উঠে পড়ল ওম্নি। দুগ্‌গা বুঝি কি চোখ ইসারাও করলে!"

ফাৎ করে জ্বলে উঠ্‌ল না ভরত বরং যেন একটু থিঁতিয়ে গেল।

"তোমার বোনের পছন্দ আছে—রজনী সা দেখতে ভালো।" সুবর্ণ ফিক্ করে হেসে দিলে।

হাসিটাকেও হজম করে নিয়ে ভরত বল্‌লে: "বেচে দিলাম পাট। কাল এসে তুলে নেবে ব্যাপারী।"

"কত পেলে?"

"একশো টাকা—"

"ধান নেই কিনে রেখো।"

"কুটির বাজারে যাব—মণ কুড়ি যদি পাই।"

"ও মা তাতে চল্‌বে কি করে—দুগ্‌গা আছে যে!"

"যদ্দিন চলে—তারপর উপোস!"

"ওম্নি তুমি মুখ শুকিয়ো না বলে দিচ্ছি! দুগ্‌গা টের পেয়েছে তোমার হা-হুতাশ! প্রায়ই বলে আমায়, বৌঠান তোমাদের ভাতে আমি এসে ভাগ বসালাম, তোমাদের পেটের শাপ লাগবে আমার উপর। ঠাট্টা করে বলে—চালাক কি না তাই। মনে মনে ওর খুব দুঃখ তোমার উপর যে পড়ে খাচ্ছে!"

মানুষের মনের খবর রাখবার সময় কোথায় ভরতের? নিজের মনের খবরও কি কখনো সে রাখতে পেরেছে? সে শুধু জানে দুবেলা ভাত খেতে হবে—সে-ভাত এনে দেবার তার কেউ নেই, মাটি থেকে তৈরী করে নিতে হবে মুখের গ্রাস।

ভরত না জান্‌লেও এ ভাত-খাওয়ার প্রশ্ন তখন সমস্ত ভারতবর্ষে। নতুন করে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে দল বেঁধে যারা গাঁয়ে গাঁয়ে এলো, বুঝিয়ে দিলে—চাষীভাই, জমিদারের খাজনা দিও না—সেই স্বদেশী ভলান্টিয়াররা ক্ষেপিয়ে দিয়ে গেল শশীদলের ভদ্রলোকদেরও। ভরত-ছিদ্দিক-রসিকের দল চেয়ে রইল পশুর মত সেই প্রবল উৎসাহের দিকে। যারা এসেছিল এদেরই ছুঁয়ে যেতে এরা তাদের ছোঁওয়া পেলেনা।

রসিক একবার বল্‌লে: "বন্ধ করে দোব খাজনা, বাবুরা ত

আমাদের দিকেই, বলে গেল শুন্‌লিনে? কোব্‌রেজের ছেলে ত রোজ সভা করে তাই বল্‌ছে!"

"খাজনা ত সব যাচ্ছে তারিণী-ঠাকুরের পেটে! বাবু সহরে বসে তার কি পায়?" ছিদ্দিক বলে।

"বাবুও গেছে না কি জেলে। বলন্টিয়ররা বলাবলি করছিল শুনেছি!"

"জেল হয়েছে বাবুর?" ভরত অসহায়ের মত দুদিকে চায়।

"বক্তিমে দিত না কি সহরে বসে বসে!" রসিকের চোখে মুখে উল্লাস।

"বড় ইমামদার লোক রে বাবু", কি যেন ভেবে বলে ছিদ্দিক: "ওর খাজনা না দিলে গুণা হবে।"

"তোরা দেগে যা আমি তারিণীঠাকুরকে দু টাকা গুঁজে দোব হাতে, এক বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত।" এত বড় সুযোগের মাথায় রসিক কিছু করে নেবে না এমন হতেই পারে না।

ভরত কথা বলে না। ভাবে বাবুর জেল হল? কেন? নিজের সম্পত্তি যার দশজনে লুটে খাচ্ছে, চুরি ডাকাতি ত সে করতে পারে না! তবে কেন জেল হয়? কিছুই জানে না ভরত, অনেক কিছু বুঝ্‌তে পারে না! তাই কিছু আর এখন বুঝতেও চায় না সে। ভাবে যা হয়ে যাচ্ছে তা হবেই। পাটের ঐ ক'টা টাকা হাতে নিয়েও তার মন খারাপ হয়নি, কুটির বাজারে দশ মণের বেশি ধান না পেয়েও বুক কেঁপে ওঠেনি তার। আগে হলে হয়ত হত। বাবুর জেল হয়েছে শুন্‌লে এক ফোঁটা জল হয়ত চোখ থেকে পড়ত তার। সেদিন টুনী

বেয়ি চেয়েছিল তার দিকে, আগে হলে বাড়ি ফেরবার পথে হয়ত সুর ধরত ভরত :

"কাঞ্চা বাঁশে আগুন দিয়া আগুন করলাম কালি
তোর সাথে পিরীতি কইরা খোওয়াইলাম জোয়ানি।"

সুবর্ণ, বংশী এরাও যেন ভরতের মনে ফিকে হয়ে গেছে। উঠোনের কানাচে এক ফালি জায়গায় মূলো করেছে সুবর্ণ, লাউ মাচা আর সিমের লতা উঠিয়ে দিয়েছ রান্নাঘরের চালায়, একাই এ সব করতে হয়েছে তাকে, কুটোটিও ছোঁয়নি ভরত। গায়ের জোরও বুঝি তেমন আর নেই তার। বংশী দাঁড়াতে শেখে, টলে টলে হাঁটেও দু এক পা, হাসলে দাঁতের কুঁড়ি দেখা যায় মাড়িতে কিন্তু তাতেও উৎসাহ নেই ভরতের।

ছিদ্দিকের বাড়ি থেকে দু দণ্ড রাত্রির পর ফিরে আসে ভরত। একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে ঢুলে ঢুলে ঝাপসা চোখে সুবর্ণ ভাত পাহারা দেয়। দাওয়ায় কুপিটা ধোঁয়া ছেড়ে অনেক আগেই নিভে থাকে।

খেতে বসে ভরত বলে: "কাল থেকে বেলাবেলি ভাত খেয়ে নোব, ছিদ্দিক ওরা খায়। তেল পুড়ে খামকা পয়সা নষ্ট।"

সুবর্ণ একটা হাই তুলে বলে: "ভালো।"

আর কোন কথা হয় না। ঘুমভরা শরীরটাকে সুবর্ণ কোন রকমে মাচার উপর তুলে আনে। হুঁকোটা নিয়ে ভরত দাওয়ায় গিয়ে বসে।

অনেক বেলা অবধি ভরত শুয়ে থাকে—ঘুম ভাঙলেও কেমন উঠতে

ইচ্ছা করে না তার। সুবর্ণ গোবর ছড়াতে উঠে যায় ঝিলিমিলি ফর্সা হতেই। তারপর ওঠে দুগ্‌গা।

কোবরেজের পুকুর থেকে হাত ধুয়ে এসেও আজ সুবর্ণ দেখে দুগ্‌গার উঠবার নাম নেই।

"দুগ্‌গা—" সুবর্ণকে ডাকতে হয়। কিন্তু সাড়া আসে না।

ঘরের সামনে এগিয়ে আসে সুবর্ণ। ঝাঁপের দরজাটা একটু ঠেলে আবার ডাকতে যায়, দেখে দরজা খোলা। তবু ডাকে সুবর্ণ: "এই দুগ্‌গা—।" দরজা খোলা রেখেই কি ঘুম দিয়েছে মেয়েটা?

ঘরের ভেতর উঠে আসে সুবর্ণ। কিন্তু কোথায় দুগ্‌গা—দুগ্‌গা নেই। নেই তার টিনের তোরঙ্গ—বেতের ঝাঁপি। তালু শুকিয়ে যায় সুবর্ণের। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

কতক্ষণ পর ছটফট করে সুবর্ণ এসে বাইরে দাঁড়ায়। ফর্সা হয়ে আসছে চারদিক। কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ আকাশের কিনারে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কিসের একটা ভয় ধরে যায় সুবর্ণের সমস্ত শরীরে। দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে ভরতকে ডাকে: "ঘুমোচ্ছ না কি—ওঠো শীগ্‌গীর—"

পীতাম্বর পানের গোছ তৈরী করতে করতে বলে যায়: "গাঁশুদ্ধু চলে যাবে রে ভরত রাজচন্দ্র সা-র খপ্পরে। কি আর দেখছিস—মাত্র ত ছিদ্দিক দু'কাণি ক্ষেত তুলে দিলে দেনার দায়ে—জয়নুদ্দি দিয়েছে সব, নকুলের এক ফোঁটা জমি নেই! বর্গা দেবে এক এককাণি ক্ষেত—সা-র পো তেমন ছেলেই নয়, সবাই মিলে জন খাট এখন তার ক্ষেতে! গাঁয়ের মাটি ছেড়ে যাব কোথায়, তা-ই করব!"

"সবই বরাত পীতাম্বরদা—" অসহায়ের ধরতাই বুলি শিখে নিয়েছে ভরত।

"রজনী সা-ও চলে গেছে ভৈরব—শুন্‌ছি আর আস্‌বে না। কর্ম্মচারীরাই দেখাশুনো করবে সব। আমাদের অবস্থা দেখেশুনে পাছে নরম হয়ে যায়, সে ভয়ে পালিয়েছে, বুঝলি ?"

"রজনী সা নেই ?" ভরত চোখ খাড়া করে চায়।

"সে ত কবেই চলে গেছে !"

ভরত গদীর দিকে তাকায়। রজনীর জায়গাটা সত্যি খালি পড়ে আছে। কবেই রজনী চলে গেছে, মুখের ভেতর জিভটা নেড়ে নেড়েই যেন বলে ভরত। দুগগাও চলে গেছে, একটু একটু মনে পড়তে থাকে তার। কোথায় গেল দুগগা ? দেওরদের ওখানেই কি ? তাই ভেবে নিয়ে দুগগার চিন্তাটার উপর একটা পর্দা টেনে দিয়েছিল ভরত। সে-পর্দা নড়ে উঠল হাওয়ায়। রজনীও চলে গেছে ! কবে গেল ? দুগগার সঙ্গেই কি ? ভরত তা জানে না। জান্‌তেও চায় না।

"ভরতদা—" রাইচরণ এসে পাশে দাঁড়াল।

কি যে হয়ে গেছে রাইচরণের চেহারা। চম্‌কে উঠেই ভরত বলে "কি রে ?"

"দাদা আমায় ভিন্ন করে দিলে ভরতদা—বলে, পারব না আর গুষ্টি পাল্‌তে !"

পীতাম্বর পেছন থেকেই বলে ওঠে : "ভাই রে, বিপদের সময় কেউ কারু নয়।"

"রসিক তোকে ভিন্ন করে দিলে, রাই?" ভরত নাভি থেকে নিশ্বাস টেনে আন্‌ল।

"দিলে। এককাণি ক্ষেত, এখন বউ আর দুধের ছেলেটাকে নিয়ে আমি দাঁড়াব কোথায় ভরতদা?" হাউ হাউ করে কেঁদেই ফেল্‌লে রাইচরণ।

"এককাণি ক্ষেত দিলে মানে? ছ' কাণির মত ক্ষেত ছিল, তাছাড়া নৌকো আছে!"

গামছাতে চোখ মুছে নিয়ে রাইচরণ বল্‌লেঃ "দেনায় না কি নিয়ে গেছে তিন কাণি—বল্‌লে নৌকো না কি বৌঠানের টাকায় কেনা, ওতে আমার ভাগ নেই!"

পীতাম্বর সান্ত্বনা দিতে চায়ঃ "বরাতে থাক্‌লে খাওয়া জুটে যাবে, রাই—ভাবিস নে। শরীর ত আছে, মেহনৎ করতে পারবি নে?"

নমঃ-র ছেলে মেহনৎ করতে ভয় পায় না—ভরত তা জানে। কিন্তু কোথায়, কি নিয়ে মেহনৎ করবে রাইচরণ? রসিকের উপর আক্রোশে সমস্ত শিরাগুলো ভরতের দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

"তুমি একটু বল্‌বে দাদাকে, ভরতদা?"

"কি বল্‌ব ওকে? ও কি মানুষ?"

"তোমরা সবাই বল্‌লে হয়ত শুন্‌বে। ছিদ্দিককেও বলে এসেছি।"

"বল্‌ব—যা তুই।"

মুখে আবার গামছাটা বুলিয়ে নিয়ে রাইচরণ চলে যায়। মজবুত শরীরটার ভেতর যেন ফাঁপা হয়ে গেছে, ওকে যেন উপড়ে ফেলেছে কেউ, শিকড় নেই। আলাদা হয়ে গেছে মাটি থেকে। চলে যাচ্ছে

রাইচরণ,—ভরতের মনে হয়, যেন সে চলে যাবে অনেক দূরে, গাঁয়ের বাইরে, কোথায় তা জানা নেই, যেমি চলে গেছে সিরাজ, মনমোহনের নাতির দল, চলে গেছে হয়ত বুঝি দুর্গ্গাও !

বাজার থেকে ফেরবার পথেই তারিণীঠাকুরের সঙ্গে দেখা। দূর থেকে ভরতকে দেখেই তারিণী খালের ধারে মাঁদার গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"তোর দেখা পাওয়াই যে দায়, কি রে ভরত ?" কথার বাড়িতেই যেন থেমে গেল ভরত : "গাঁয়েই ত আছি কত্তা—"

"সে কথা হচ্ছে না—গাঁ থেকে আর পালাবি কোথায় ? মেয়ে মানুষ ত নোস্ !"

একটা হাতুড়ি যেন ধক করে ভরতের পাঁজরের উপর পড়ে। সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে তার। কিন্তু পরক্ষণেই তা সাম্‌লে নেয় : "আপনি কি তলব দিয়েছিলেন, কত্তা ?"

"তলব দোব—শোনে কে ? জমিদার ত তোদের কাছে ফক্কিকারী হয়ে গেছেন। লায়েক হয়ে উঠেছে রজনী সা ! জমিদারের গমস্তার কথা রজনী সা-র কুটুম শুন্‌বে কেন ?"

পাথরের মত মুখ নিয়ে ভরত তারিণীর দিকে তাকায়—সমস্ত রকম আঘাত নিতে পারে যে মুখ।

"ডাকলামই যখন—বল্‌ছি শোন্।" তারিণী আর বেশি ভণিতা করতে চায় না : "তোর উপর খাজনা ধার্য্য হয়ে গেছে। বাবু ফাটকে গেছেন, ফিরে আসতে ছ'মাস। আমার উপর যখন সর্ব্বস্ব ছেড়ে

দিয়ে গেছেন, খাজনাপত্র চালিয়ে বিষয়-আশয়টা ত আমাকেই সাফ্-সুরৎ রাখতে হবে!"

"আমাকেও খাজনা দিতে হবে কত্তা?"

"কাড়ি কাড়ি টাকা লুটছিস আর জমিদারের খাজনা দিতে হলেই চিঁ চিঁ ডাকতে সুরু করিস্—বেশ মজা পেয়েছিস্!"

"টাকা নেই কত্তা—এবার উপোসে মরব।"

"রঙ্গনী সা-র গদীতে ত টাকা ফুরোয় নি—সাড়ে বারোটা টাকা কাল সন্ধ্যের আগে কাছারী বাড়িতে পৌঁছে দিস—নইলে খামকা হাঙ্গামা হুজ্জুত হবে!"

ভরতের অবস্থাটা দেখবার জন্যেও তারিণী ওখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না। ভরত চেয়ে রইল তারিণীর লম্বা লম্বা পা-ফেলার দিকে—মনে হল পাগুলো যেন তার বুকের ভেতরটা মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ফাল্গুন এসে গেল—ক'টা বীজধানই জোগার হল না ভরতের, কোথায় পাবে সে সাড়ে বারো টাকা! ছিদ্দিকের কাছে ধান চাইতে পারে না ভরত—গত তিন মাস ছিদ্দিকের বাড়ি শুদ্ধ লোক এক বেলা খেয়ে এসেছে! তবু চাইলে এক আধ সের ধান হয়ত ছিদ্দিক দেবে—কিন্তু ভরত কি করে চায় তা? রসিকের দশা আরো খারাপ। আশ্বাস দিয়েছে বটে সে রাইচরণকে কিন্তু রসিক যে কত অভাবে ভাইকে ভিন্ন করে দিয়েছে তার খবর ভরত রাখে। আশ্চর্য্য—রাগটা পর্য্যন্ত এখন আর রসিকের নেই—এক কথা দু'কথার পর চট করে

সে কেঁদে ফেলে—চোখ ভাসিয়ে জল দাঁড়ায়। একখানি জমি রেহান দিয়ে রজনীর গমস্তা রমেশের কাছ থেকে আবার পঁচিশটা টাকা ধার এনেছে ভরত—আবার টাকা চাইতে গেলে কি রেহান দাবী করে কে বল্‌বে! তবে রেহানী তমসুকে টিপ দিতে এখন আর ভয় করে না ভরতের। জানে একবার জমি রেহান পড়লে আর তা ছুটতে চায় না—তবু মাটির ঢেলার চেয়ে থালার ভাতের দাম অনেক বেশি। ভাতের বদলে যদি জমি যায় ত যাক্—ভরত আর বেশি কিছু বুঝ্‌তে চায় না।

টাকাটা পেয়ে তারিণী খুসী হয়, বলে: "বুঝ্‌লি ভরত আয় নেই মহালের, নইলে কি আর তোদের উপর জুলুম করি? আর যখন ছিল—চেয়েছি একটা পয়সা? ওম্নিত খেয়ে যাচ্ছিস তোরা সব। জমিদার এখন আর বাঁচেনা, কি করবো!"

একদণ্ডও ওখানে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না ভরতের। শঙ্কর রায়ের আমল জুলুম জান্‌ত না—একের পর এক মহাল তার নিলেমে উঠেছে—প্রজার উপর জুলুম চালালে মহালগুলো থাকৃত—শঙ্কর তা করেনি। ভরত এ কথা ভাল করেই জানে—গাঁয়ের লোক তাকে পাগল বলুক—ভরত জানে এ পাগলামিতে নিজের গা-ই তার ছিঁড়ে গেছে, প্রজার গায়ে একটু আঁচড়ও লাগেনি।

প্যাদাকে ডেকে একছিলিম তামাকের ব্যবস্থাও তারিণী ভরতের জন্যে করতে চাইলে। ভরত বারান্দার উপরই মাথা ঠুকে একটা প্রণাম করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছিদ্দিক বল্‌লে: "টাকাটা মিছামিছি দিতে গেলি কেন ভরত?

ও টাকা কি বাবু পাবে? ঠাকুরের পেটেই যাবে পুরোপুরি। খাজনা আদায় করে খেয়ে দেয়ে মুখ মুছে কাঁদ কাঁদ হয়ে নায়েব তহশীলদাররা বাবুর কাছে এসে বল্‌ত, প্রজার দারুণ অভাব, খাজনা আদায় হল না। বাবু বিশ্বাস করতেন। তা-ই ত আজ জমিদারীর এই হাল!"

"আমায় ভয় দেখালে তারিণীঠাকুর।"

"খেতে পাইনে। আমাদের নেই—দোব কোত্থেকে? যখন থাক্‌বে দোব!"

"কত্তা থাক্‌লে সে-নালিশ চল্‌ত রে ছিদ্দিক!"

"ফাটকে আছেন কত্তা—কিন্তু তিনি ত আছেন। তারিণীঠাকুরের রায়ত আমরা নই—কত্তা চাইলে বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা দিতে রাজী আছি আমরা—কিন্তু তারিণীঠাকুর টাকা নেবার কে?"

ছিদ্দিককে দেখে ভরতের ভয়-ভয় করতে থাকে। আগের মত যেন সে আর নেই। কেমন খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। তা ছাড়া স্বভাবটাও কেমন যেন বিগড়ে যাচ্ছে তার। রজনী সা-র গোলা থেকে একদিন ধান চুরি করবার মতলবও সে করেছিল। ভরত বাধা দিতেই বলে, আমাদের নেই, ওর অনেক আছে—কটা বীজধান আন্‌লে তাতে গুণা হয় না। ভরতের কিন্তু বরাবরই মনে হয়, এ অন্যায়।

ছিদ্দিকের গোঁ ফেরাবার জন্যে বলে ভরত: "বাবুর ফাটক হল কেন রে?"

"সরকারের সঙ্গে ঝগড়া হল।"

"সরকারের সঙ্গে ঝগড়া হল? বাবুর বাড়ির সঙ্গে সরকারের লোকদের খাতির ছিল কত! দারোগা পুলিশ কত এসে বুড়ো কত্তাকে সেলাম জানাত!"

"বাবু স্বদেশী হয়েছিল। দেখিস নি বক্তিমে দেয় যে স্বদেশীরা—ওরকম।"

"তারা ত বলে জমিদারকে খাজনা দিও না—বাবুও তাই বলেন, নিজে জমিদার হয়ে?" বাবু কি বলেন ছিদ্দিকের তা জানা নেই। বাঁক ঘুরে সে অন্য কথা বলে: "তারিণীঠাকুর যদি জবরদস্তি দেখায়, ভরত, এখুনি বলে দিচ্ছি আমি—একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে!"

যা হয়ে উঠেছে ছিদ্দিক, তা সে খুবই পারে। নিজের বোকামিতে আফশোষ হয় ভরতের। খাজনা দেবার কথাটা সে ছিদ্দিককে না বললেই পারত। ছিদ্দিক, রসিক, লোচন কেউ যখন খাজনা দিতে পারবে না তখন ফষ্টি করে খাজনা দিতে যা সেও কেন গিয়েছিল! ভরতের মনে হল গাঁ শুদ্ধ লোকের উপর সে অন্যায় করেছে।

মনে হয় একটা দিনও এদের চলবে না—চল্‌তে পারে না। তবু রাত শেষ হয়ে সূর্য্য উঠতে থাকে বারবার—এরা মরে না, বেঁচে থাকে। উপোস করেও বেঁচে থাকতে জানে এরা। মাটি ধান দেয় না—আলু-কচু যা-ই দেয় তা-ই কুড়িয়ে কাঁচিয়ে ক্ষুধার আগুনে ফেলে দেয় সবাই। সকাল বেলাটার ভুরভুরে কাদার গন্ধ গায়ে মেখে হয়ত

তুলে আনে এক মুঠো পোকার মত ক্ষুদে মাছ। তাই দিয়ে মুখ পাল্টে নেয়।

বংশী ভাত খায়। গাইটা বেচে দিয়ে কয়েকটা টাকা হ'ল ভরতের। তেমন আবার বলদ দুটো আছে, ওদের কিছু কিছু খড় বিচালি চাই। গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে চাষীর ছেলেদের মধ্যে মারামারি হয়। ওই ভীড়ে গিয়ে গরু নিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে না ভরতের।

সুবর্ণের মুখে কথা নেই—হাসিও নেই। রাতদিন খেটে কিছু তরিতরকারি ফলিয়েছে। তাই কিছু কেটেকুটে সাজিয়ে বসে থাকে, কখন ভরত চাল তেল নূন নিয়ে আসবে।

বাজারে ভীড় আছে। চাষীরা সবাই বাজারটা একবার ঘুরে যায়। কিছুই কিনবে না কেউ তবু তারা আসে। কি কি জিনিষ উঠ্‌ল তাই একবার চোখে দেখে যাওয়া মাত্র। তেল নূনের দোকানে ক্বচিৎ দু'একজনের দু এক পয়সার সওদা চলে।

পীতাম্বর বলে: "এবারে এ গাঁয়ে দোকান উঠ্‌ল রে ভরত—কুটির বাজারে যাব ভাবছি।"

শুক্‌নো ঠোঁটে ভরত বলে: "পান খেয়ে আর ঠোঁট রাঙাবে কে বল?"

পীতাম্বর ভেংচি কেটে বলে: "পান খাবার সময় কি দিস্‌ তোরা বৌদের—মুখ থেকে খোলা-ই ত নাবে না ওদের!"

সত্যি ব্যাঙাচির মত গাঁ-ভরা পিল্‌পিল্‌ করছে ছেলেপিলে! খেতে পায় না তবু ঝাঁক বেঁধে আসে এরা। মরে অনেক কিন্তু তার চেয়েও

বেশি বেঁচে থাকে। পোকামাকড় যেমি করে বাঁচে এরাও তাই—ভরত অবাক হয়ে যায়। একা বংশীকে বাঁচাবার জন্যে সুবর্ণের চিন্তার অবধি নেই। রসিকের আটটা ছেলেমেয়েকে রসিকের বউ কি করে বাঁচায় ?

"গাঁয়ে খাবার নেই—মরতেও লেগেছে লোক! যারা মরে তারা ত বেঁচে গেল। বেঁচে গেল শীতল!" পীতাম্বর গল্পে জমে উঠতে চাইল।

"শীতলমামা মারা গেছে ?" সমস্ত শরীরটা ভরতের সোজা হয়ে ওঠে।

"জানিস্ নে ? কাল রাতেই ত মারা গেছে! পাগল মেয়েটার এখন দশা ভাখ!"

"হঠাৎ—শীতলমামা এত হঠাৎ—"

"হঠাৎ! না খেয়ে খেয়ে শীতলের ছিল কিছু শরীরে ?"

না খেতে পেয়ে লোক মরেও যায় ? হয়ত যায়। খবরের চোটটা চুপসে নিল ভরতের শরীর। না খেতে পেয়ে লোক যদি গাঁ ছেড়ে চলে যেতে পারে তবে আর গাঁয়ে থেকে মরতে পারবে না কেন ? ভরত স্বাভাবিক হয়ে আসে। স্বাভাবিক হয়ে আসে গাঁয়ের চেহারা তার চোখে।

টুনীর চোখে জল নেই দেখেও অবাক হয় না ভরত।

"খুব জ্বর আর রক্তবমি হচ্ছিল—ভাখো ভরতদা, তোমাকেও খবর দেবার সময় হল না!"

"কি বিপদই তোর যাচ্ছে টুনী—" অনেক খুঁজেপেতে এ কথাটাই মাত্র জুটিয়ে আন্‌লে ভরত।

"দিন ত বসে থাকে না ভরতদা, দিন চলে যায়—এ ক'টা দিনও চলে যাবে আমার কোনোরকমে।"

টুনীর কথার যেন ঠিক মানে ধরতে পারল না ভরত—আঁকুপাকু করে বল্‌লে: "তোর এখন চল্‌বে কি করে বল্‌ত!"

"বাবা কি চালাতে পারত যে এখন আর চল্‌বে না? তাছাড়া তুমিই ত আছ! চাইলে দেবে না খেতে?"

"আমি—আমার কাছে তুই খেতে চাইবি কেন?" ফ্যাকাসে হয়ে আসে ভরতের মুখ।

"যদি না জোটাতে পারি চাইব না?"

মাথায় একটু আধটু গোলমাল এখনও আছে টুনীর—ভরত ভাবে। আউস ফল্‌লে টুনীকে যে খেতে দিতে পারে না ভরত তা নয় কিন্তু লোকে কি বল্‌বে? দুগ্‌গার ব্যাপারে এম্নিতেই লোকের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারে না সে। তারপর নিজেও যদি তেম্নি কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তাহলে গাঁয়ে টেঁকবারই যো থাকবে না তার।

"কি, ভয় পেয়ে গেলে ভরতদা, খাওয়াতে হবে ভেবে?" মুখ কালো করে হাসে টুনী।

আসল জায়গাটায় খোঁচা খেয়ে ভরত লজ্জা পায়: "একা একটা মানুষের খাওয়ার আবার ভয়!"

"চিন্তা করো না ভরতদা—আমি কাজ করতে জানি। মরাই-এ কাজ করতে পারব, ঢেঁকিতেও ধান ভান্‌তে পারব। তাতেও যদি

ভাত না জোটে বামুনদের বাড়ি গিয়ে ঘর লেপে দোব, কাপড় কাচব, বাসন মাজতেও আপত্তি নেই আমার !"

তবু সে স্বামীর ঘর করতে যাবে না ? কেমন বিশ্রী লাগে ভরতের কাছে। রাগ সবারই হতে পারে। রাগ করে চলে আস্তে পারে সে বাপের ঘরে কিন্তু তা বলে কোনোদিনই স্বামীর কাছে যাবে না ? মনে প্রশ্ন আসে কিন্তু কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করতে পারে না ভরত। প্রশ্নটাও শেষে আপনা থেকেই তলানি পড়ে যায়। যে যেম্নি ভাবে ভালো থাকে, তেম্নি থাকুক সে। শুধু থেকে যাওয়াই ত সব—শুধু বেঁচে যাওয়া। কার কোথায় দোষ হল, কি হবে এত খোঁজ নিয়ে। তুগগার উপরও মন আর তার রুখে নেই। তুগগার ভালো সে করতে পারত না কোনোদিন, তার মন্দ হাওয়াতে রাগ করে লাভ কি ?

"দেখছ ত বাবা নেই—তুমি আসবে ত মাঝে মাঝে ভরতদা ?"

কথাটা যেমন শোনাবার ভরতের কানে যেন তেমন শোনায় না। এম্নি আরো অনেক অনুরোধ যেন তার মনে অনেকদিন থেকে জমে আছে, কথাটার সুরে তা-ই যেন অনুভব করল ভরত। চোখ তুলে চেয়ে রইল সে অনেকক্ষণ টুনীর মুখের দিকে! ভালো লাগে—সত্যি ভালো লাগে টুনীকে তার। কিন্তু আবার কখন ভুলে যায় সেই ভালো লাগা তা সে বুঝ্তে পারে না। ভুলে যায় আবার মনে করবার জন্যেই। ভুলে যায় কিন্তু মুছে ফেলে না।

"কি দেখ্ছ ? রোগা হয়ে গেছি। খেতে পাইনে, তাই !"

"তোর কাছে টাকা আছে টুনী ?" শ্বাসবন্ধ করেই জিজ্ঞাসা করে ভরত।

"টাকা ?" আবার সেই কালো হাসি আসে টুনীর মুখে : "টাকা থাক্‌লে কেউ উপোস করে, ভরতদা ? টাকা থাক্‌লে কি কোবরেজ মশাই আসেন না—এক ফোঁটা অষুধ পড়েনি বাবার মুখে !"

"নিবি—আমি যদি দিই !"

"তোমার কাছে খেতে চাই আর তোমার টাকা নোব না ?" কোনো লজ্জা নেই টুনীর গলায়।

"কালই তোকে দিয়ে যাচ্ছি পাঁচটা টাকা।" ভেতর থেকে ভরতের শরীরটা কে যেন কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল। এখানে বসে থাকবারও উপায় নেই তার অথচ মনে হচ্ছিল উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে সে পড়ে যাবে।

ঘরে একটাও টাকা নেই—ভবত ভাবছিল বাড়ি না গিয়ে সরাসরি সা-র গদীতে রমেশের কাছেই যাবে কি না। কোবরেজেব ছেলে হেমন্ত পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে ভরতকে।

ভরত গড় করে দাঁড়াল—শীতল মহাপুরুতের বাড়ি না যান কোবরেজ মশাই, সুবর্ণের অসুখের বেলায় তিনি যা করেছেন ভরত তা ভুল্‌তে পারে না। তা ছাড়া হেমন্ত স্বদেশী লোক, গাঁয়ে ভদ্রলোকদের সবার মুখেই তার নাম ! তাকে ভক্তি না জানালে ভরতের গাঁয়ে থাকা উচিত নয়।

"ভৈরব গিয়েছিলুম, ভরত, বড় একটা মিটিং ছিল। হ্যাঁরে, দুগ্‌গা ভৈরবে থাকে ? কে যেন বল্‌ছিল বজনীই ওব খরচপত্র দেয়। ষ্টীমারঘাটে আস্‌বার সময় ওকে পথে দেখলুম, আমায় দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে !"

"ও চলে গেলে আমি কি করব কত্তা—" না কেঁদে যে ভরত কথা কইতে পারল তার জন্তে নিজেই সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

"না, তুই কি করবি! ছেলেমানুষ ত নয় ও। কিন্তু আমি ভাবছি রজনীর কথা! মেয়েটাকে যে তুই ফুস্‌লিয়ে নিয়ে গেলি, দুদিন বাদে ত আর ওর দিকে ফিরেও তাকাবিনে—তখন ওর দশাটা কি হবে?"

"ওর কথা আর আমায় শোনাবেন না কত্তা। আমি ভাবি, দুগ্‌গা মরে গেছে।"

"না—দেখা হল কি না তাই খবরটা তোকে বললুম—দুগ্‌গা আছে ভাল, অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হল।" হেমন্ত পুকুরে গিয়ে নাম্‌ল।

ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই ফাঁকা দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌ল ভরত কতক্ষণ। তারপর পুকুরের পাড় দিয়ে বাড়ির রাস্তাই ধরল।

গাঁয়ের সবার কাছেই একটা ভাসা-ভাসা খবর ছিল দুগ্‌গা রজনী সা-র সঙ্গেই গেছে। সুবর্ণও তাই জান্‌ত। চৈতনের বউও তার চেয়ে জোরালো প্রমাণ কিছু আনতে পারে নি। দুগ্‌গার কথা বললেই বুচি না কি মুখ টিপে শুধু হাসে। ও জানে হয়ত সব কিন্তু বলবেনা কিছুই। ওসব মেয়ের ধরণই ও-রকম হয়।

"হেমন্ত ঠাকুর দুগ্‌গাকে ভৈরব বাজারে দেখে এল—" কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই ধপ করে ভরত ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ল। দুগ্‌গাকে নিয়ে তার মনের ঘা-টা আজ অনেকদিন পরে টনটন্ করে উঠেছে। মিছেই সে ভেবেছিল যে ও-ঘা শুকিয়ে গেছে।

"দেখে এলো ?" কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠ্‌ল সুবর্ণ।

"শশীদলে কি একদিন পা বাড়াবে না রজনী—আমি দেখে নোব ওকে !"

"থাক্‌—আর হ্যাঙ্গামায় দরকার নেই, একবার ত মুখে কালি পড়েছে আবার মাখ্‌তে যেয়ো না।"

"কি বল্‌ছ তুমি ?"

"ঠিক কথাই বল্‌ছি।"

ভরত চুপ করে যায়। কিন্তু রজনী সা-কে ক্ষমা করে না।

একটা কাপড়ের কাণিতে খানিকটা চাল বেঁধে নিচ্ছিল ভরত। সুবর্ণ দেখে বল্‌লে: "কাকে দেবে ?" লুকোনো গেল না তাই একটু বে-দিশা হয়ে পড়ল ভরত: "না—ও বল্‌ছিল কি না !"

"কে ?" সুবর্ণ একটু হাস্‌লে: "আমি ত মানা করছিনে, নিয়ে যাও, কিন্তু দেবে কাকে ?"

"রাইচরণকে—" তাড়াতাড়িতে খুঁজে পেতে রাইচরণের নামটাই মনে করতে পারল ভরত !

"ও—তাহলে ধার দিচ্ছ ?"

"না ধার নয়। ওর ভীষণ অভাব।" পুটুলিটা রেখে হাত ঝাড়তে লাগল ভরত।

"ভরতদা—" এম্নি ক্লান্ত আর দুর্ব্বল সুর যেন শ্মশান যাত্রায় কেউ ভরতকে ডাক্‌তে এসেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভরত। রাইচরণই এসে উপস্থিত !

"কোথায় ভরতদা, বল্‌লেনা ত তোমরা কেউ দাদাকে—"

"বলব, ভাবিসনে। বিষ্টিটা পড়ে যাক, তখন বল্‌ব। ওর মেজাজ এখন খিঁচড়ে আছে।"

"তিন দিন নদীতে কৈবর্ত্তদের সঙ্গে মাছ ধরে এসেছি, একটাকা রোজগার। বুকের দুধ শুকিয়ে উঠেছে বউএর, ছেলেটা উপোসে ট্যাঁ ট্যাঁ করে।"

বসে বসে এই প্যান্‌প্যানে ইতিহাস শুন্‌তে ভাল লাগ্‌ছিল না ভরতের। এ রকম ত ঘরে ঘরে। লোকের কাছে বলে বেড়াবার কি এত দরকার। এখন এসে উপস্থিত হবারও বা কি দরকার ছিল রাইচরণের ?

"তুই যা রাই।" বিরক্তিটা সাম্‌লে নিয়ে ভরত বলে: "আজই একবার যাব আমি রসিকের কাছে।"

"যেয়ো কিন্তু ভরতদা—দোহাই তোমার।" কথার চেয়েও মুখে বেশি অনুনয় দেখিয়ে রাইচরণ চলে গেল।

সুবর্ণ যেন ওৎ পেতে ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্‌লে: "ওমা—চালটুকু দিয়ে দিলে না—তুমি কেমন ?"

"ও লোক খারাপ। মিছিমিছি রসিকের বদনাম করে বেড়ায়। রসিক কি করবে ? বলে নিজের পেটেই ভাত দিতে পারে না আবার তার উপর ওর গুষ্টি !" রাইচরণের উপর অনর্থক ক্ষেপে উঠ্‌ল ভরত।

বৃষ্টি পড়ল। এবার সবাই আউস তুল্‌বে—আর পাট নয়। পাটে এদের লোপাট করেছে তাই তার কাছে আর সহজে কেউ ঘেঁসবে না।

বীজধান যোগাড় হয়েছে ভরতের কিন্তু খাবার ধান ফুরিয়েছে। তিন মাস খোরাকি চালাতে হবে ধান কিনে! চল্লিশ টাকা হলেই হয়ে যাবে কোনোরকমে। হিসেবের বেলায় ধার ঘেঁসে হিসেব করে ভরত—খরচের বেলায় দেখা যায় হিসেব ফেঁসে গেছে। হাতে ধরে সুবর্ণকে আটহাতি শাড়ি সে দিতে পারে না, একবেলা খেয়ে থাকবার কথাও ভাবতে পারে না ভরত। পাঁচ মাসে তাই উড়ে গেছে পাট বিক্রির একশ টাকা—মাঝে সুবর্ণের শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাই ধান না কিনে চালই কিনতে হয়েছে। তাছাড়া নূন ভাতও ভরত খায়নি। তারপর ধার করেছে। রমেশ লোক মন্দ নয়। চাইলেই টাকা পাওয়া যায়। যদিও রজনীরই টাকা সব। তবু রজনী ত আর দেখ্‌তে আসছে না কে টাকা নিলে। ভরত যদি টাকা না নেয় রজনীর তাতে কি? সে ত একবার জান্‌বেও না যে ভরত টাকা নিলে না!

রমেশের কাছ থেকে চল্লিশটা টাকা নিয়ে এল ভরত। বাঁধা পড়ল তাঁর পাঁচ কাণি জমি। বাঁধা পড়্‌ল কোন্ এক কাগজের পাতায়, পড়ে আছে যা রজনী সা-র লোহার সিন্দুকে—সে-খবর ভরতের না রাখলেও চলে। তার জমি তারই আছে—রজনীর লাঙ্গল চল্‌বে না তাতে, চল্‌বে ভরতেরই লাঙ্গল। জমির গায়ে বেড়ি পড়েনি, তাই আর ভরতের চিন্তা করবার কারণ নেই। আর বেড়ি পড়লেও বা কি সে করতে পারে? কি তার করবার আছে?

অনেকদিন হয়ে গেল টুনীকে বলেছিল ভরত পাঁচটা টাকা দেবে। টাকাগুলো হাতে নিয়ে কথাটা মনে পড়ল ভরতের। চোরের মতই শীতল

মহাপুরুতের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল সে। কিন্তু কোথায় টুনী? মর্চে-ধরা একটা তালা লাগানো দরজায়। টুনীও কি চলে গেল? কিন্তু গাঁয়ের কেউ-না-কেউ তবে বলত ত সে কথা! গাঁয়ের সবাই জানে টুনী পাগল। পাগলের খবর রাখবার উৎসাহ হয়ত কারো নেই। উঠোনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ভরত। পাঁচটা টাকা দেবে বলেছিল সে। দিতে পারে নি। দিতে এসেছিল আজ। কিন্তু টুনী নেই। ভাত চেয়েছিল টুনী। সামান্য কয়েক মুঠো চাল পর্য্যন্ত এনে দিতে পারলে না ভরত। কি এমন হত সুবর্ণকে খোলাখুলি বললে? হয়ত টুনী বার চেয়েছিল ভরতের—আজ, কাল করে অনেকদিন। তারপর চলে গেছে কোথায়—কে জানে?

একা থাক্‌লে কাঁদতে ইচ্ছা করবে ভরতের। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে।

বৃষ্টি পড়ে—ধানের চারা বড় হয়। অশথগাছের তলে আবার জটলা জম্‌তে সুরু করে।

"ফসল ভালো দেবে এটা—খোদা আর কদিন উপোস রাখবেন!" ছিদ্দিক বলে।

ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকে ভরত যেন একটা কুকুর খাবারের দিকে চেয়ে আছে। চিম্‌সে মুখটা আরো চিম্‌সে করে রসিক আস্তে আস্তে তামাক টানে।

"উঠোনের বেড়াটা তুলে ফেলরে রসিক—রাইএর মনে বড্ড লেগেছে।" ছিদ্দিক সময় বুঝে সুপারিশ তোলে।

রসিক তার ঘোলা চোখ দুটো তুলে চায় কেবল। ভরত রসিকের জবাব শুনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকায়। রসিক কথা বলে না। কথা বলবে কি? ও যেন জোর করে বেঁচে আছে মনে হয়। দশ বছর আগেকার ওর পাথর-কোঁদা চেহারাটা কোথায় গেল? কালো কুঁচকানো ঠোঁটের দু'পাশে সাদা ঘায়ের দাগ—যেন মুখটা হাঁ করিয়ে ঠোঁটের জোড়া টেনে কেউ ছিঁড়ে দিয়েছে। কপালে সেঁধিয়ে গেছে চোখ, পাকৃতে সুরু করেছে চুল। বেশি আর কি, বুকের হাড়ও উঁকি দিতে সুরু করেছে এ ক'দিনে।

"এ ধানে ক্ষেত বাঁচিয়ে কি পেট বাঁচানো চলবে রে ছিদ্দিক?" হাপরের মত জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দেয় রসিক।

"বড় আগুতি ভাবিস্ তুই রসিক—" রসিকের হতাশা ভরত পছন্দ করতে পারে না।

"তুই একা নোস্—খোদার যদি মর্জ্জি থাকে সবাই এক সঙ্গেই মরব।"

"খোদার গজব কি শুধু আমাদের উপরই শাণিয়ে আছে? আমরাই শুধু অপরাধ করি, আর সবাই ভালোমানুষ?" হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে রসিক।

বড় কঠিন প্রশ্ন। এর জবাব ছিদ্দিকের জানা নেই।

"সত্যি ত—ছোট কর্ত্তার উপর কেন গজব বল্‌ত! ফাটকও ত হল তাঁর!" ভরত রসিকের পক্ষ নেয়।

"যতই বলিস রসিক, খোদার পানি খোদার মাটি, ফসল দিলে খোদাই দেবেন—তুই আর আমি হাবুডুবু করলেও কিছু এগোবে না।"

ছিদ্দিকের কথায় ভরত অবাক হয়ে থাকে। রজনী-সার গোলায় আগুন দিতে চেয়েছিল ছিদ্দিক। বলেছিল তখন, খোদা যখন নেই শয়তানের শাস্তি আমরাই দোব। আজ আবার খোদার উপরই সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সে! অভাবে পড়লে মাথা ঠিক থাকে না কারো। তাই হয়ত হয়েছিল ছিদ্দিকের। ভরত কিছু বলে না, রসিকের হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নেয়।

"গাঁশুদ্ধ্ লোককে ত মারতে বসেছেন খোদা! মরে হেজে উজোর হয়ে যাচ্ছে মানুষ! ভাত নেই—ভাত মেলে না। মহাপুরুতের মেয়ে কুড়ি বাড়ির ঘর লেপে চাল চেয়ে আনে! ঋষিবাড়িতে গিয়ে কোন্ দিন আমরাও পাত পেতে বস্‌ব!" ক্ষুধার চেয়েও জাতটাকে বড় করে তোলে রসিক।

অনিচ্ছুক ছিদ্দিকের হাতে হুঁকোটা গুঁজে দিয়ে ভরত রসিকের কথায় কান পাতে। টুনী তাহলে গাঁ ছেড়ে চলে যায়নি! ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না ভরত। কি ভাবে এরা কে বল্‌বে! রেহাই করে কথা বলে না ছিদ্দিক। চোখ মুখ দেখে পাছে কেউ কিছু সন্দ করে সেই ভয়ে বেশি রকম চুপচাপ হয়ে যায় সে—তাতে মুখ আরো ভারি দেখায়।

টুনী বলে: "ভেবেছিলাম পরদিনই আসবে। যখন এলে না তখন মনে হল তোমার কত কাজ এখন ক্ষেতে, তাই হয়ত আসতে পারো নি।"

"টাকা নিয়ে এসেছিলাম তারপর একদিন—দেখি ঘর তোর তালাবন্ধ!"

"কুড়ি বাড়িতে চাল করে দিয়ে এলাম দু'মণ। তারাই খেতে দিলে—চার গণ্ডা পয়সাও দিয়েছে!"

"সত্যি টুনী—কাল তোকে টাকা দিয়ে যাব।"

"তোমার কাছেই থাক। ধান তুল্‌বে যখন ঘরে—খেটে দিয়ে আসব—তখন দিও।" পরিষ্কার একটা হাসি টুনীর মুখে। তাতে ভরতের মনে হল তার যেন অপরাধের সীমা নেই।

"ভেবেছিলে গাঁ ছেড়ে চলে গেছি! কোথায় যাব? যাবার কি জায়গা আছে? তোমরা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেও এ গাঁয়ের মাটিই কামড়ে থাকতে হবে।"

"তুই রাগ করেছিস টুনী—টাকাটা দিয়ে যেতে পারিনি বলে?"

"রাগ?" এক মুহূর্ত্ত মাটির দিকে চেয়ে থাকে টুনী তারপর ছলছল চোখ তুলে বলে: "তোমার উপর রাগ করতে পারব আমি কখনো?" আর কিছু না বলে ঘরের ভেতরে চলে যায় সে! ভরত তবু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন টুনী আসে না, তখন তার ভারি শরীরটাকে টানতে সুরু করে পা।

অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ যেন কোথায় ফেটে গেছে আর তাই জলের ধারা বইছে নাগাড়ে। পুকুর খাল ভরে উঠে জল ভেসে গেল। জলাগুলোকে মনে হয় বিলের মত। এবার জল না থামলে উঠোনে দাঁড়িয়ে যাবে জল। এম্নিতেই সাপ ব্যাঙের অন্ত নেই—তারপর ঘরে সাপ উঠে মানুষ কাটতে সুরু করবে। পচে গেল বাড়ি ঘরদোর, পচে গেল গা হাত পা, ধানের চারাগুলোও বুঝি পচে

যাচ্ছে! ভরতের বুকটা দুরদুর করে ওঠে। ছিচ্ছিক অবিশ্যি বলে, জলের মাথায় মাথায় ধানের চারা বেড়ে যায়—বিষ্টির জলে চারা ডোবে না, কিন্তু এম্নি জলের সঙ্গে কাঁহাতক পাল্লা দেবে চারাগুলো? রসিক বলেছে, পাহাড়েও যদি এম্নি ধারা বৃষ্টি হয়ে থাকে তবে আর রক্ষা নেই। সব জল এদিককার নীচু জমিতে নেমে আসবে—তারপর সব শেষ।

রসিকের কথাই ফলবে মনে হয়। চওড়া খালের মত পাহাড়ী নদী আছে একটা—জেলা সহরের গা ঘেঁসে, এদিককার গাঁগুলোকে ছুঁয়ে মেঘনায় গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ী জলের নৰ্দ্দমা এই নদী—চওড়া যেমন নয় গভীরও নয়। দুদিনের বৃষ্টিতেই ঘোলা জলের স্রোত ছুটতে থাকে। দশ দিনেও কামাই নেই যখন বৃষ্টির, সহরের দিককার উঁচু বাঁধ বেয়ে উঠতে লাগল জল। ওপারের নীচু জমি ভাসিয়ে দিয়ে গাঁ গুলোয় উঁচু ভিটেও ছুঁই ছুঁই করছে। তবু জলের শেষ নেই। বৃষ্টি থেমে এল, জল কম্‌ল না। সহরে ঢোল পেটান হল—সাবধান, বাঁধ ভাঙতে পারে নদী। ওপারের গাঁয়ের লোকেরা রাত জেগে পাহারা দেয়, মাটি কেটে বাঁধ তোলে, যাতে ভাসা জমি আর না ডুবে যায়। কিন্তু এদের চেয়েও সহরের আর সহরের লোকের জীবনের দাম বেশি। সহর রক্ষার ভার যাদের উপর তারা এক রাত্রিতে পনের মাইল ভাটিতে গিয়ে ওপারের অরক্ষিত বাঁধ কেটে দেয়। রাতারাতি সহরের বাঁধের উপর জল কমে আসে এক হাত।

নদী ছুটেছে—আতঙ্কের চীৎকার ওঠে গাঁয়ে। সামনের গাঁগুলোর গরুছাগল, গাছগরান, ঘরদোর কুটোর মত ভেসে যায়। কল্‌কল্‌

করে ভয়ঙ্কর শব্দ উঠছে চারিদিকের আকাশে, আর কিছু শোনা যায় না। যেন এখানে মানুষ ছিল না কোনোদিন—মানুষ আসতে পারে নি—মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে ঘোলা জল। অন্য রকম শক্তি এ জলের—মানুষের জীবন তাকে কেউ বলবে না—বলবে বৈতরণী।

বন্যার ভগ্নাংশ এল শশীদলে। তাই যথেষ্ট। ধানের চারাগুলোর উপর এক হাত জল দাঁড়িয়ে রইল সাতদিন। ডগার পাতা মুষড়ে ছিঁড়ে নেতিয়ে গেল ঢেউ-এর বাড়ি লেগে। আতঙ্কের চীৎকার নয়, এখানে উঠল মর্ম্মভেদী কান্নার সুর।

ছিদ্দিক বলে: "গাড়ী আসতে এখনো অনেক দেরি। গাড়ি আসাতক নৌকোয়ই থেকে যা ভরত।"

"কেরায়া পাবি নৌকোর, না ছিদ্দিক?" গুটিসুটি বসে ভরত আলাপের ভূমিকা করে।

"রোজ হয় না। গাঁয়ে ফিরে যাই তখন।"

"লগি ঠেলা ছেড়ে দে ছিদ্দিক—তোর শরীর ভেঙে পড়েছে।"

"একেবারে ত ভেঙে যায় না, তাহলে বাঁচতাম। এখনও শরীর ভাত চায়, না খাটলে ভাত পাব কোথায়?

"ছেলে দুটো রয়েছে কি করতে? বুড়ো বাপকে এক মুঠো ভাত দিতে পারে না তারা?"

"পরের ক্ষেতে জন খাটে—বউ আছে কুলোবে কি করে বল!"

"বর্গা নিয়ে নিক্ ক'কানি জমি!"

"বর্গা কেউ দেয় না।"

ভরত চুপ করে যায়। বেঁচে থাকবার মত কিছু নেই ছিদ্দিকের। তবু বেঁচে আছে সে। শশীদলের মাটি ওকে ছাড়তে চায় না—আরো ভোগাবে বলে ধরে রাখে। অনেক পুরুষের ভিটে ওদের—ছোট বেলায় ভরতও দেখেছে উটের পিঠের মত কুঁজো বড় বড় ঘর। প্রকাণ্ড খড়ের গাদা। তার চূড়ার কালো হাঁড়িটাকে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দেওয়া ছিল তাদের খেলা। আজ কিছু নেই এদের, তিন খানা মাত্র ডেরা—বাড়ির আদ্ধেক বিক্রী হয়ে গেছে, বাকি আদ্ধেক বন্ধকে বাঁধা। কোথায় গেল সব—কেন গেল? ছিদ্দিক বলে খোদার গজব। গজব দিতেই কি ছেলেপুলে পাঠান খোদা? ফসল না হলেও জমিদারের খাজনা দিতে হত—টাকা নেই বলে মহাজনের সুদ না দিলে নিলেম হয়ে যেত ক্ষেত—তাও কি খোদার গজব? সহরের লোকেরা সহর বাঁচাতে গিয়ে বন্যার মুখ খুলে দেয় গাঁয়ের দিকে, ছিদ্দিক কি তাকেও বল্‌বে খোদার গজব? ভরতের মনে পড়ে সেবারকার বন্যার কথা। মনে পড়লে এখনো বুকের একটা জায়গা যেন তার খালি হয়ে যায়। কি যে করে দিয়ে গেল এ কাল জল তাদের!

ভরত পাগলের মত ছুটোছুটি করছিল। তারিণীঠাকুর বেঁকে বসে আছে। বলে—"একবার যখন খাজনা উসুল হয়েছে—আর

বাকি থাকতে পারে না। এ কি আমায় দিচ্ছিস?—পাচ্ছে জমিদার, পাচ্ছে সরকার। দেশের মালিক তারা। আমি ত গমস্তা। না দিতে পারিস জমি ছেড়ে দে—যার সম্পত্তি তার তবিলেই আসুক।"

রমেশ ক্ষেপে উঠল তারিণীর চেয়েও বেশি: "তোদের দিয়ে বিশ্বাস নেই! ধান মরে গেল বলে কি?—তোরা ত মরিস নি! টাকায় টাকা দিলুম এখন আবার আদালতে ঘোরাঘুরি করে মরব! ক্ষেত বন্ধকে নমস্কার বাবা। সোনা রূপো ছাড়া একটি টাকা আর গদী থেকে বেরুবে না।"

জল সরে গেল। থিঁতিয়ে আছে ক্ষেতগুলো। পলিমাটির তলানি পালিশ হয়ে মিশে আছে ক্ষেতের গায়ে। দুশ্চিন্তাগুলো ভরতের তলানির মত মিশে গেল মনের অন্ধকারে। দুরুানি ক্ষেতে আবার রোয়া ধান করে তুলেছে ভরত। পলিমাটির নূতন সারে বেড়ে উঠছে ফন্‌ফন্‌ করে গাছগুলো তবু তার উৎসাহ নেই। ছিদ্দিকেরও যেন বুকটা ভেঙে গেছে। রসিক প্রায় শয্যাগত। রাইচরণই দাদার ক্ষেতের তত্ত্বতালাসি নেয়। একটু উৎসাহ, যা দেখা যায় রাইচরণেরই আছে।

ঘামে চুপ্‌চুপে শরীর নিয়ে এসে দাঁড়ায় রাইচরণ, বলে: "করুক শালা নালিস—একটি পয়সা দোব না রমেশকে বুঝলে ভরতদা? যে ফসল বন্ধক ছিল তা-ত মারাই গেছে—কাত্তিকের ফসলে ও হাত দেবে কেন? তবে হ্যাঁ বেইমানি করব না—খেয়ে-পরে যদি কিছু থাকে, দিয়ে দোব, সুদে কাটিয়ে নিক!"

রাইচরণের বুকের পাটা আছে। বয়েসে অল্প। জানে না মাটি

পায়ের নীচে থাকে—সে-মাটির সঙ্গেই জড়াজড়ি তাদের—কাজেই মাথা হেঁট করেই তাদের রাখতে হয়, উঁচু করলে চলে না। মাটির মতই সয়ে যেতে হয় রোদ আর বাদল—মাটি ফেঁপে, ফুলে, গর্জ্জে ওঠে না কোনোদিন, তারাও তাই বুক ফুলিয়ে কারু মুখের উপর দাঁড়াতে পারে না। মনে মনে হাসে ভরত। অনেককেই দেখল সে রাইচরণের মত—আবার তাও দেখল যে শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। রমেশের কাছে অনেক কান্নাকাটি করেছে ভরত—কিন্তু রগ তার সোজা হয় নি। জমি বন্ধকের খত পাল্টে নিয়েছে সে—জমিদারের মুখের কথায় জমির উপর স্বত্ব হয় না বলেছে—সে-জমি না কি বন্ধক রাখা চলে না—নতুন তমসুকে বাড়ি-বন্ধক দিতে হয়েছে ভরতকে। কাগজের গায়ে এই নতুন টিপটা আঁকতে শরীরের সমস্ত নাড়ী যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল ভরতের। এও ভেবেছিল একবার—দুগ্‌গার কাছে চলে যাবে সে ভৈরবে, দুগ্‌গা বললে হয়ত রজনী সা তাকে বাড়ি-বন্ধকের দায় থেকে রেহাই দেবে!

রমেশকে সুদ না দিয়ে উপায় আছে ভরতের? বাড়িতে এসে নিলেম জারী করে বস্‌বে।

"সবাই যদি আমরা সুদ বন্ধ করে দি—ও একা কি করবে!"

কি-কি যে করতে পারে ভরতও কি তা সব জানে! তবু যেটুকু জানে তা-ও সে বলে না। হালের বলদের মত খেটে মরছে রাইচরণ, শুনলে হয়ত ওর আর হাত পা চল্‌বে না। কি দরকার বলে? ফসল যদি বেশী হয়—সুদ দিয়েও খাওয়ার জন্যে থাক্‌বে খানিকটা। তা-ও বা মন্দ কি? খাটুক—খেটেকৃযা রাইচরণ।

বংশী হাঁটে, দৌড়য়, কথা বলে, বাড়িটাকে মাথায় তুলে চেঁচায়। বিরক্তই হয়ে উঠে তাতে ভরত। সুবর্ণ কথা বলে না। মুখ বুজে টুকিটাকি কাজ করে যায়। এবারেও লাউ গাছ তুলছে সে—মুলোর বীজ ছড়িয়েছে। কাঁথা শেলায় হয়ত খানিকক্ষণ—তার চেয়ে বেশি সময় শুয়ে থাকে।

চেহারাটা ভাল মনে হয় না—ভরত সন্দেহ করে।

আশঙ্কা নিয়ে একদিন প্রশ্নই করে বসে ভরত: "বংশীর বয়েস কত হল?"

"আড়াই বছর হয়ে গেছে। তোমার চিন্তা নেই!" ভরতের আশঙ্কাটা বুঝতে বাকি থাকে না সুবর্ণের।

"বংশীর সময়ে যে ফাঁড়া গেছে!" কথাটার মোড় একটু ফিরিয়ে নেয় ভরত।

"বারবারই তাই হবে না কি?" লজ্জা পেয়েই যেন সুবর্ণ ঘরের ভেতরে চলে যায়।

সন্দেহ বা আশঙ্কা নয়, সত্যই। আরো অবসন্ন হয়ে আসে ভরতের শরীর। এক পাল ছেলেপিলে তারও হতে পারে—কি খাওয়াবে সে তাদের? চিন্তা করতে থাক্‌লে আজকাল আর নাক চোখ কান জ্বালা করে ওঠে না তার, কেমন যেন ঝিমুনি আসে। গামছাটা দাওয়ায় বিছিয়ে শুয়ে পড়ে ভরত।

পূজোয় যা কিছু ভীড় হয় কুড়ি বাড়িতেই। রায় বাড়িতে ঘট-পূজো দিয়েই তারিণী ঠাকুর দায় সারে। রাজচন্দ্র সা-র বাড়িতে থাকে না কেউ তবু গমস্তরা যেমন তেমন করে একটা মূর্তি দাঁড়

করায়। প্রতিমা হয় কুড়ি বাড়িতে—যাকে বলা যায় প্রতিমা। গাঁয়ের লোক সেখানেই তাই ভেঙে পড়ে।

ঢাকের বাদ্যিতে বুক টিপ্ টিপ্ করে ভরতের। পূজোর ক'টা দিন কানে আঙ্গুল দিয়ে কাটাতে পারলে যেন সে বাঁচে। ছিদ্দিকের সঙ্গে ক্ষেতে নেমে খানিকক্ষণ সে আগাছাও বেছে আসে তাই। কিন্তু বংশীকে একবার নিয়ে যেতে হয়ই পূজো বাড়িতে।

ভরতকে দেখেই যুধিষ্ঠির কুড়ি হাতছানি দিয়ে ডাকে। বুঝতে পারে না ভরত হঠাৎ তাকে কি দরকার পড়ল যুধিষ্ঠিরের।

"শিবপুর যেতে পারবি ভরত?"

"শিবপুর?"

"হাঁ—শিবপুরে কানি দশেক জমি আছে আমাদের জানিস্ ত?"

"তা আমি সেখানে যাব কেন?"

"এখন নয়—কালিপূজোর শেষে—"

"কেন তাই বল না!"

"ধানটা কাটবার জন্যে লোক দরকার ক'জন।"

"কদিন লাগবে?"

"চার পাঁচ জন যোগাড় হয়েছে আরো—তোদের পাড়ার চৈতাও যাচ্ছে—ক'দিন হবে তুই-ই বলনা!"

"তিন দিনত খুব লাগবে!"

"তা লাগুক—"

"রোজ কত দিচ্ছ?"

"যত্তই দিই ঠকাব না।"

একটু থেমে থাকে ভরত। ভাবে চৈতনও যাচ্ছে। অমত করবার কিছুই নেই। কুড়িরা ভাল লোক। পয়সা মারা যাবে না ঠিক।

চার গণ্ডা পয়সাও এখন ভরতের কাছে সোনার মতো।

"কেমন, কথা দিচ্ছিস্ ত ?" ব্যস্ত হয়ে তাকায় যুধিষ্ঠির।

"যাব—যাব।" কথা দেয় ভরত।

কাজ পায়না ভরত যেন কূল দেখতে পায়। কিন্তু ফুরতি আসে না মনে একটুও। কাজের শেষে যুধিষ্ঠির যদি তাকে পয়সা না-ও দেয় তবু যেন তার মনে দুঃখ হবে না। তবে কাজ করতে সে যাবে, পয়সার আশায়ই যাবে। পয়সা দরকার। যেমন ভাত খাওয়া দরকার তেম্নি। তার জন্য উৎসাহ আর নেই তার।

বাড়ি এসে সুবর্ণকে জানায় খবরটা। সুবর্ণেরও চোখ মুখের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু বলে : "বাড়ি ছেড়ে ত থাকোনি কখনও।"

বাড়ির মায়া ভরতকে দেখিয়ে লাভ কি ? বাড়ির গায়ে সে শুধু দেখতে পায় রজনী সা-র নাম। যদি নিয়েই যায় রজনী কোনোদিন এ বাড়ি—সেদিন কি দুগ্গা তার সঙ্গে থাকবে ?

ছিদ্দিক বলে : "এসেই কাটবি ধান—দুদিনের ত মেহনৎ লাগবে। তৈরী হতে পনেরো দিন খুব।"

"চুরি না যায়—দেখিস ভাই !"

"চুরি করবে কোন্ শালা—কাঁধে আর তবে মাথা আস্ত থাকবে ?"

"ঋষিপাড়ার লোকগুলো তাকিয়ে আছে—ফাঁক পেলেই সাবড়ে দেবে !"

"যা যা—অত কিছু তোর ভাবতে হবে না !"

ছিদ্দিক গচ্ছিত রাখ্‌লে সত্যি কিছু ভাবনার নেই। ছিদ্দিককে সন্দেহ করে রসিক। রসিক দেবতাকেও সন্দেহ করতে পারে। সন্দেহ করা ওর বাতিক। ভরত ভালো করেই জানে ছিদ্দিককে, ইমানদার লোক সে।

সুবর্ণকে সাবধান করে দেয় ভরত: "একা থাকোনি ত কখনও—বংশীর ওপর নজর রেখো—দৌড়েই কিন্তু ও কোবরেজ পুকুরে চলে যায়।"

সুবর্ণ হেসে বলে: "তুমিই যেন এতদিন ওকে দেখে এসেছ আর কি!"

হাসিতে মন দেয় না ভরত, বল্‌তে থাকে: "টুনীকে বলে গেলাম এসে দেখাশুনো করবে—রেতে এসে ঘুমোতেও পারে যদি বল!"

"মোটে ত তিন দিন। টুনীকে কেন লাগ্‌বে আমার?"

"একটা ডাকের মানুষ ত তবু?"

চৈতন বাইরে থেকে ডাকে: "ভরতদা, বেলা করে ফেল্লে—"

সুবর্ণের কোলে বংশীর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নেয় ভরত। তারপর সুবর্ণের দিকে চেয়ে ঠোঁটে একটু মরা হাসি নিয়ে বলে: "চলি—"

মুখে হাসি রেখেই সুবর্ণ চেয়ে থাকে। গামছার পুটুলিটা বগলদাবা করে ভরত বেরিয়ে যায়। দূরে এসেও একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে ভরত সুবর্ণ ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

পরের ধান। তবু ধান দেখেই ভালো লাগে ভরতের। এত ধান সে নিজ হাতে কোনদিন কাটেনি। পনেরো জন এসেছে তারা। তবু তিন দিনে হলে হয়।

চৈতন বলেঃ "এক আধটা বস্তা নিয়ে যেতে পারলে হত। ওমর বল্‌ছিল সে না কি নেবেই। বাড়ি থেকে অম্বিকা নিয়েই এসেছে একটা খালি বস্তা।"

"কেন? কুড়িরা ত পয়সাই দেবে মজুরী!"

"তা-ত দেবেই। ওটা আমাদের উপরি। অঢেল ধান—দশ বারো বস্তা নিয়ে গেলে গায়েও লাগ্‌বে না কুড়িদের।"

"ওসব কাজে তুই যাস্‌নে কিন্তু চৈতা—" শুক্‌নো মুখে হা-হা করে ওঠে ভরত।

"আমি ত একা নই—সবাই বল্‌ছে।"

বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকে ভরত। মাঠভরা পাকাধানের ঝিন্‌ঝিন শব্দ হচ্ছে—তার সঙ্গে কাস্তের খস্ খস্ আওয়াজ। শুন্‌লে ঝিমুনি আসে। কিন্তু পনেরোটা উদলো পিঠে ঘামের উপর রোদ পিছলে পড়ে, যন্ত্রের মত চল্‌তে থাকে ওদের হাত। মাথায় গামছার ফেটি—যেন খানিকটা দুর্দান্তই দেখায় ওদের। ধারালো কাস্তের মুখে ন্যাড়া হতে থাকে ক্ষেত—লুটিয়ে পড়ে তার ধানছড়ি বিনুনী।

ধানের বস্তা ভরত কিছুতেই নেবে না। চৈতনকে বোঝায় অম্বিকাঃ "না নিয়ে হয়ত ফাঁসিয়ে দেবে আমাদের। এক কাজ কর চৈতা—ওর ভাগটা তুই-ই নিয়ে যা। গাঁয়ে পৌঁছে ওর বাড়িতে ফেলে দিয়ে আস্‌বি!"

চৈতনও তেম্নি বোঝাতে আসে ভরতকেঃ "নিজ হাতে তুমি বয়ে নিওনা ভরতদা—নিয়ে যাব আমিই, বৌঠানের কাছে গিয়ে দিয়ে আস্‌ব।"

ভরত প্রতিবাদ করে না। হয়ত এটা ঠিক চুরি নয়! অনেক ধান হয়েছে, চাইলেও কুড়িদের কাছে এক আধ মুঠো পাওয়া যাবে। পাওয়া যখন যাবে—ওটা নিতে আর দোষ কি? শুধু ওদের কাছে বলা হল না, এইমাত্র।

ধানের জন্যে নয়, কাজ শেষ হয়ে এল তাই মনটা খুবই হাল্কা হয়ে যায় ভরতের। এবার বাড়ি যাবে। পাঁচ দিন মাত্র বাড়ির বাইরে সে। তবু মনে হচ্ছে কত যুগ ধরে যেন সুবর্ণকে দেখতে পায়নি। চৈতন বাড়ির কথা তুল্‌লেই সে-কথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভরত। সুবর্ণ মস্করা করতে পারে, জন খেটে ত এলে শিবপুর থেকে, শিবপুরের বাজার থেকে আমার জন্যে কি আন্‌লে? শাড়ী? দেখি কেমন? শাড়ীই আন্‌লে যদি বংশীর জন্যে একটা পিরান আন্‌তে কি হয়েছিল? বাজারটা ভরত একবার ঘুরে আসে। ওমর সর্দার জন পিছু তিন টাকা দিয়ে দিয়েছে। বাকিটা হিসেব হবে গাঁয়ে ফিরে। হাতের মুঠোতে টাকা তিনটে নিয়ে কাপড়ের গদীতে ঢুকেও পড়ে ভরত। রজনীর দোকান এর চেয়ে ঢের ভালো। তবু এ-বিদেশ। এখানকার জিনিষের কদর আলাদা। কিন্তু তিন টাকাতে কাপড় আর পিরান কুলোয় না। ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ভরত। কি যে সে ঝোঁকের মাথায় করতে গিয়েছিল! ঘরে যার চাল নেই শাড়ী কিন্‌তে যায় সে কোন্ সাহসে? টাকা পেলেই সুবর্ণ খুসী হবে—মনকে প্রবোধ দেয় ভরত।

চৈতনকে তার বাড়ি পৌছে দিয়ে নিজে যখন বাড়ি আসছিল ভরত,

তখন আর বেলা নেই। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে কার্ত্তিকের কুয়াশার ছায়া মিশে এ সময়টা যেন কেমন ভারি হয়ে থাকে। ভরতের মনে হচ্ছিল সে ভীষণ একা—সঙ্গী সাথী তার কেউ নেই, শরীরেও শক্তি নেই—তবু হেঁটে চলেছে। চলেছে কোথায়, কোন্ অন্ধকারে সে নিজেও যেন তা বল্‌তে পারবে না।

উঠোনে পায়চারি করছিল টুনী। ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। ভরত এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে আন্‌ল যেন টুনী—কেশেই হয়ত গলাটা পরিষ্কার করে নিলে।

"টুনী?" ভরত এগিয়ে এল: "ওরা সব কই?"

"তুমি কিছু শোননি ভরতদা?" কান্নার মত শোনাল টুনীর কথা।

"কি শুনিনি? কি হয়েছে?"

"বৌঠান আর বংশী ওলাওঠায় চলে গেছে কাল।" থরথর করে কাঁপছিল টুনী।

সমস্ত বাড়িটা চরকির মত ক'বার ঘুরে এল ভরতের চারদিকে—চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। পায়ের আর শরীরের ওজন ধরবার ক্ষমতা নেই। উবু হয়ে মাটির উপর বসে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল ভরত।

বোচনের ঠেলাঠেলিতে ফল হল না—ছিদ্দিককেই আস্‌তে হল।

দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল টুনী। বল্লে: "এসে অবধি এক ফোঁটা জল মুখে নিলে না, তুমি একবার বলে ছাখোনা!"

গলা ঝেড়ে নিয়ে ডাক্‌ল ছিদ্দিক: "ভরত—" বেহুঁসের মত ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে ভরত—নিশ্বাস নিতে হয় বলে নিশ্বাস নিচ্ছে।

"খোদার মর্জ্জিরে—ভাই, নইলে চার পহরের মধ্যে এমন সর্ব্বনাশ হয়ে যায়!" গভীর করে একটা নিশ্বাস টেনে নেয় ছিদ্দিক।

মুখ তুলে একবার তাকায় ভরত। চোখ দুটোর লাল রগগুলো এখুনি যেন ছিঁড়ে রক্ত পড়তে সুরু করবে। তুফানের মত ছুটে এসে ভরত ছিদ্দিকের গলা জড়িয়ে হাউ হাউ করে ওঠে: "তোরা ত ছিলি রে ছিদ্দিক—তবে কেন ওরা মরে গেল।"

"ও কাল ব্যারাম—কোবরেজের ওষুধে মান্‌ল না। গাঁয়ের পাঁচ বাড়িতে এখনো লেগে আছে ঠাকরুণের কোপ।" ছোট শিশুর পিঠে যেন হাত বুলোতে থাকে ছিদ্দিক: "সরকারি ডাক্তার এসেছে আজ—ওষুধ ছড়িয়ে দিচ্ছে পুকুরে। তবে বাপের বেটি এ-মেয়ে ভরত—আমরা আর কি করলাম? চেয়ে দেখলাম শুধু—বুনের সেবাও এম্নি কেউ করে না, ও যা করেছে!"

এবার সত্যি ছলছল করে ওঠে টুনীর চোখ। দাওয়া থেকে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আস্তে আস্তে।

"কি কাল কাজে আমি গিয়েছিলুম ছিদ্দিক—সোনার ঘর আমার পুড়ে গেল—" কান্নার হিক্কা উঠছিল ভরতের। ছিদ্দিক অবাক হয়ে যাচ্ছিল, ভরতও এম্নি ভাবে কাঁদতে পারে? কাঁদুক। কেঁদে নিক খানিকটা। নইলে আর ঠাণ্ডা হবে না ও। কি আর রইল ভরতের? কার মুখ চেয়ে থাক্‌বে বা! আপনা থেকেই চোখ বুঁজে আসে ছিদ্দিকের—চোখের পাৎলা কুঁচকানো পাতা ভারি হয়ে যায়। ভরতের কান্নার শব্দগুলো তার বুকের ভেতরে গিয়ে বিঁধছে।

ভরতকে ছিদ্দিক ভেসে যেতে দেবে না। জোর করেই তাকে অশ্বত্থগাছের তলে এনে বসায়। একটা লাঠিতে ভর করে রসিকও এসে বসে।

সোনার রং এসেছে ক্ষেতে। রোগা মুখেও রসিক একটু হাসতে চায়। রসিকের সঙ্গে মস্করা করে ভরতকে ভুলিয়ে রাখে ছিদ্দিক: "ধানের গন্ধে টিয়ে পাখী বেরোয়—প্যাঁচাও ঘর ছেড়ে এলো দেখছি!"

রসিক ভুরু উঁচিয়ে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করে।

"তোমার ধান এবার সব রাই-এর ঘরে নিয়ে তুল্‌ব—কি বলিস্‌ ভরত? দাও আরো ভাইকে ভিন্ন করে!"

"এখন আর কোথায় ভিন্ন!" ঠাণ্ডা গলায় বলে রসিক।

"কাজ পড়েছে তাই এখন ছোট ভাই—কেমন?"

উত্তরে যেন একটা তেতো ঢোঁক গেলে রসিক।

"ধান কাটতে আস্‌ছিস কবে ভরত?" খুব সহজ গলায় ছিদ্দিক জিজ্ঞাসা করে।

"হুঁ—" ভরত এক ঝলক নিশ্বাস ছেড়ে দেয়।

"হুঁ মানে? কাটতে হবে না ধান?"

"কাটব।"

"কাটব বল্‌লেই:ত কাটা হবে না। কাস্তে নিয়ে ক্ষেতে নাম্‌তে হবে ত!"

"তুই-ই কেটে নে গে যা ধান।"

"দরবেশ হয়ে যাবি না কি তুই?"

"ধান দিয়ে আর কি করব আমি?"

"মরা বাঁচা কি তোর ইচ্ছে, ভরত, ওতে জবরদস্তি চলে না—দেবতার ইচ্ছে সব।"

"তা ছাড়া কি?" অনেকক্ষণ ঝিমিয়ে থেকে রসিক বলে: "গাঁয়ের ছেলেরা গেছে পাহাড়ে—সবাই বল্‌ছে রক্ষাকালীর পা ছোঁওয়া ফুল বাড়ি এনে না দিলে গাঁয়ের মানুষ আর বাঁচবে না!"

ভরত হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে—মনে হয় যেন কেঁদেই ওঠে: "কালীকে রোজ রোজ আমি ডাকিনি আমার বউ-ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে—রেখেছে বাঁচিয়ে? মহেন্দ্র তিলিকে বাঁচিয়েছিল কালী—হয়নি তার ফাঁসী? কালী বাঁচিয়ে রাখে! বল্লেই হল!"

রসিক থতমত খেয়ে যায়। শব্দ করে হুঁকোটা টান্‌তে সুরু করে ছিদ্দিক।

কি রকম ক্ষ্যাপাটেই যেন হয়ে গেছে ভরত—ছিদ্দিক হাল ছেড়ে দিল। রাতটা কোনোরকমে বাড়িতে কাটায়—সমস্ত দিন গাঁয়ের রাস্তাঘাটে ভোঁ ভোঁ করে। এক সময় হয়ত হাজির হয় টুনীর বাড়িতে।

"কিছু খেতে দিবি টুনী?"

"ভাত খেয়েই যাও—" টুনী অনুরোধ জানায়।

"তাই সই—দে।"

ভাত বেড়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে টুনী। ভাতগুলো নিয়ে ফেলাছড়া করে খানিকটা খেয়ে উঠে যায় ভরত। তাতেই ছোট ছোট খুসীর রেখায় টুনীর রোগা মুখটাও সুন্দর দেখায়।

"তোকে বড্ড জ্বালাতন করছি—নিজেই চাট্টি ফুটিয়ে নোব এবার।"

"দু' মুঠো ভাত তোমায় আমি ফুটিয়ে দিতে পারিনে ভরতদা?"

"ডালও ত রেঁধেছিস—অনেক হ্যাঙ্গাম ডাল রাঁধতে।"

"কত হ্যাঙ্গাম! ত্যাখোনা জিভ বেরিয়ে গেছে খাটুনিতে!" একটু অভিমানী দেখায় টুনীর চোখ। ভরত কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোকার মত হাসে: "খাব তোর এখানেই। নইলে রাগ করবি তুই।"

টুনীর কাছেও বসতে ইচ্ছা করে না অনেকক্ষণ। ছটফট করেই যেন বেরিয়ে আসে ভরত। তারপর কোথায় যাবে? বাজারের পথ ধরে ভরত। এখনও যে বাজার বসে যেন ভুলেই গিয়েছিল সে। বাজারে কেনা বেচা আর লোকজন জড় হয় কি না তাই দেখতে ইচ্ছা করে।

ভরতকে দেখেই রমেশ কুড়ি দু'হাত নেড়ে বলে: "টাকা পয়সা আর চেয়োনা বাপু—ওসব দেওয়া দেওয়ি সব খতম হয়ে গেছে।"

ভরত মাথা ঝুঁকে ঝুঁকে হাসে।

"হাস্‌ছ কি মালের পো—তোমাদের আর টাকা দিতে পারব না।"

"টাকা নেবে ত?" মুখে তেম্নি হাসি ভরতের।

"ও তাই বল।" ব্যস্ত হাতে রমেশ খাতাপত্র হাতড়াতে থাকে।

"একটা কাগজ দাও কুড়ি, টিপ সই যদি লাগে—বাড়িটা দিয়ে দিলুম তোমাদের। ধরে যদি ক'টা টাকা দাও ত দিও।"

"তা হলে ত একটু বস্‌তে হয়। তামুক খাও মালের পো।" রমেশ রাশি রাশি কাগজপত্র ঘাঁটতে সুরু করে।

"তারিণীঠাকুরকেও বলে এলাম, ছিদ্দিক—" হাঁটুর উপর থুতনিটা রেখে বলে ভরত: "তবিল বুঝে নাও ঠাকুর—গচ্ছিত রেখেছিলে জমি

ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। ছোট কত্তা নেই, একটা গড় করে যেতাম তাহলে। বলতাম, কত্তা জমি দিয়েছিলে—এখন ফিরিয়ে নাও—জমির কাজ আমার ফুরিয়েছে।" ফোঁপাতে সুরু করে ভরত।

দাড়ির উপর হাতটা চালিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে থাকে ছিদ্দিক।

"ধানটা ছিদ্দিক তুই-ই নিয়ে নিস্—আর মন খানেক টুনীকে দিতে পারিস্!"

চম্‌কে ওঠে ছিদ্দিক বলে: "আমি নোব? হারাম। পুরুতের মেয়েই নিয়ে নিক—করেছে, তোর জন্যে মেয়েটা করেছে ভরত—চোখে ত তুই দেখিসনি—আমরা দেখেছি।"

"মন আর টিঁকছে না—ঘুরে আসি কদিন। ছ'টা টাকা দিয়েছে কুড়ি।"

"হেঁ—ঘুরে আয় ক'টা দিন—পাতলা হয়ে যাবে মন।"

ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে। ক্ষেতে এখন মানুষের ভীড়। যারা জন খাটে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো একটা করে শামুক আর টুক্‌রি নিয়ে দল বেঁধে ক্ষেতে নামে। মাটিতে ছড়ানো ধান কুড়িয়ে নেবে। তাড়া খায়। এক ঝাঁক মৌমাছির মত ছুটে পালায় তারা—আবার জমে আসে—ভর্‌তে থাকে টুকরি।

এদের কথা আর হাসির শব্দ কানে আসে ভরতের। চিকণ মোলায়েম আওয়াজ। শোনা যায় যেন বংশীর গলা। গুণ গুণ করে ভরত অন্যমনস্ক হতে চায়। তারপর গলা ছেড়ে গান ধরে:

কি শেল মারিলি ভাই তীরন্দাজ রে—
না দেখলাম হরিণার মুখ

না দিলাম ছাওয়ালরে দুধ
বিনা দোষে মারলি শেলের ঘাই—ভাই রে!

সিগ্‌ন্যালের বাতি জ্বলে ওঠে—ঘণ্টা বাজে। ছিদ্দিক বলে, "দুষমন আস্‌ছে!"

ছোট ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম্‌ কাঁপিয়ে গাড়ি এসে থামল। হাঙ্গামা বেশি কিছু নেই—দু চারজন যাত্রী ওঠানামা করে। ঘাটের মাঝিরা গলা উঁচিয়ে চেয়ে থাকে প্ল্যাটফরমের দিকে।

দুজন নেমেছে এ গাড়িতে। কাছের গাঁয়েরই কেউ। তাদের জন্য নৌকো এসেছে বাড়ি থেকে।

ভরত ব্যস্ত হয়ে ওঠে: "যাত্রী নেই দেখা যাচ্ছে ছিদ্দিক—"

"রোজ থাকে না।" ছিদ্দিক একটুও ব্যস্ত হয় না।

"চলে যাবি?"

"কি আর করব?"

"তা হলে যা—আমিও ইষ্টিশনের টুলের উপর গা গড়িয়ে নি।" ভরত নৌকা থেকে নেমে আসে।

"হঃ—" ছিদ্দিকও উঠে দাঁড়ায়। তারপর লগি ঠেল্‌তে সুরু করে।

অন্ধকারে খানিকক্ষণ নৌকোর উপর ছিদ্দিকের কুঁজো শরীরটা দেখা যায়। ভরত চেয়ে থাকে। এখনও মজবুত আছে ও শরীর—বেতের মত বেঁকে যায় কিন্তু ভাঙে না।

টুলের ওপর এসে বস্‌ল ভরত। গাড়ি চলে গেছে। লাইনের উপর পেছনের লাল আলোটা এখনও টিমটিম দেখা যায়। গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে ভরত। পয়েণ্টসম্যান পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার শরীরটা যেন শুঁকে যায়, বলে না কিছু।

দূরে চলে যাচ্ছে গাড়ি—শব্দটা তার ফিকে হয়ে আসে। হুইসিলের আওয়াজ ধারাল ছুরীর মত কেটে দিয়ে গেছে দুপাশের গেঁয়ো স্তব্ধতা। ভরতের মনও অনবরত কথা বলে যেতে থাকে। এম্নি গাড়িতে সে সাত বছর আগে জেলা সহরে গিয়েছিল, ছ'টাকা পুঁজি নিয়ে! সনাতন বল্‌ত সহর গাঁয়ের মত নয়, গাঁ ছেড়ে একদিন সহরে চলে যাব—সহরের লোক এখনও গান বাজনা শোনে—পয়সা দেয়, গাঁয়ে উপোস করে মরতে সে আর থাকবে না। গাঁয়ে থেকেই মরেছে সনাতন, উপোস করে কি না ভরত জানেনা—কিন্তু তার মুখেই সহরের কথা শুনে ভরত একদিন সহরে গিয়েছিল।

সাত বছরের আয়ু খুইয়ে এসেছে ভরত সেখানে কিন্তু মনে রাখবার মত কিছুই পায় নি। ভরতকে দিয়ে যেন কোনো দরকার ছিল না সহরের—পথের কুকুরের যেমন দরকার নেই। তবু খেতে হয়েছে তাকে সাতটা বছর—ছ বছর চার মাস নিত্যানন্দ পালের মস্ত মুদী দোকানে মুটের কাজ করেছে ভরত। হোটেল থেকে ভাত কিনে খাওয়া, রকে পড়ে ঘুমোনো, পিঠ বাঁকা করে মোট বয়ে নেওয়া—আর রাত্রিতে আধ ঘণ্টার জন্যে পাশের গয়লার দোকানে বসে গলা ছেড়ে গান গাওয়া। ঘুমোতে যাবার আগে মথুর গয়লা তার পুষ্ট পেটটাতে হাত বুলিয়ে বল্‌ত: "এবার তামুক খাও ভরত—" মথুরকে তামাক সেজে দিয়ে ছুটি হ'ত ভরতের।

এম্নি করেই চলে যেত হয়ত আরো অনেকদিন। কিন্তু ঘাড়ের হাড় বিগ্‌ড়ে বসল ভরতের। ভারি মোট নিয়ে দাঁড়াতেই পারতনা সে। ওম্নি জবাব। ছয় ছ'টা বছরে একটু চোখের পর্দ্দা জমল না নিত্যানন্দের।

এম্নি গেল বছরগুলো—গাড়ি-টানা গরুঘোড়াগুলোর বছর যেম্নি যায়। মথুরের কাছে একটা সন্ধ্যার মাত্র খোরাকি চেয়েছিল ভরত। দুধওয়ালাদের সঙ্গে দুধের কলসী নিয়ে টানাটানি করছিল মথুর—তার দিকে না চেয়েই বল্‌লে: "যে মাগ্যির দিন—চাল নিয়ে আয় একসঙ্গে ফুটিয়ে খাওয়া যাবে।"

তারপর আরেক পালা সুরু। সরাসরি এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে ঢুকেছিল ভরত। নোংরা কাপড় পরনে, চোখ দুটো লাল: "লোক লাগবে—বাবু?"

বাবু বললেন: "চাকর? বাড়ি কোথায়?"

"শশীদল।"

"নিত্যানন্দের দোকানে ছিলিনে তুই? তাড়িয়ে দিলে কেন? চুরি টুরি করেছিস নাকি?" বাবুর কথার উপর গিন্নী উঁকি দিলেন। অল্প বয়েস—মোলায়েম মুখটা—কিন্তু কথাগুলো ধারালো: "ছাখো না চোখগুলো কি লাল—চোর না হয়ে যায় না।"

"চোর ছ্যাঁচড় নই বাবু—জিজ্ঞেস করুন গে পালের দোকানে।"

লোকের হয়ত দরকার ছিল খুব। জিজ্ঞাসা না করেই ভরতকে রাখলেন বাবু।

কুপিত গ্রহ হয়েই ছিলেন গিন্নী। থালাবাসন মাজতে দিলে ভরত না কি ক্ষয় করে তাদের দফা শেষ করে দেয়। ফর্দ্দমত বাজার থেকে জিনিষ ত আনেই না—যা-ও তিনবার ঘরবাজার দৌড়ে জিনিষ আনে,

পয়সার হিসেব কিছুতেই মিলবে না। তাছাড়া ভরত খায় বেশি—অনেক ভাত। এ-গিন্নী দেওরকে স্বামীর পর করে তুল্‌তে পারে আর ভরত ত চাকর! তবু সাতটা মাস আশ্চর্য্যভাবে টিঁকে রইল সে। না টিঁকে উপায় কি—কোথায় যাবে? গিন্নীর কথার তোড়ে অসহ্য হয়ে বেরিয়ে আসত ভরত কোন কোনদিন। রাস্তার ধারে বাঁধান পুলটার উপর বসে গাইতে থাকত: "গুরু ও, আমায় ভাসাইলা সায়রে--"

শেষে বাবুই বললেন একদিন: "ভরত, আমার এখানে তোর থাকা হবে না—মাস পুরে নি, তবু চার টাকাই মাইনে তোকে দিয়ে দিচ্ছি—তুই চলে যা।"

আবার এসে ভরত গাড়িতে উঠল—যে গাড়ি শশীদল যাবে। ছয় টাকা নিয়ে এসেছিল সহরে—চার টাকা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। দু'টাকা লোকসান।

শশীদলে নেমেই ভরত অবাক চোখে একবার চারদিকে চাইলে। একটু দূরে পাহাড়। পাহাড়টাও যেন নূতন। কোথায় সে ধ্বসে যাওয়া কালিবাড়ি? লাল ইটের নূতন বাড়ি উঠেছে—পরিষ্কার ঝাড়জঙ্গল সব। সাহেবরা এসে থাকছে না কি এখানে? ম্যালেরিয়ার ভয় নেই?

নৌকো-ঘাটে ছিদ্দিককে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ভরত।

"কেরায়া নিতে এসেছিলাম—নেই কেউ—তুই-ই চল ভরত।" শুকনো চোয়াল নেড়ে বলে ছিদ্দিক।

ছেলেমানুষের মত দুপদাপ করে নৌকোয় গিয়ে ওঠে ভরত।

নৌকো চলে। কথার মুখ খুলে দেয় ভরত: "পাহাড়ে কে এলো রে—নতুন বাড়ি দেখলাম সব!"

"চা-বাগান হবে, আবাদ হচ্ছে! কত কি কলকব্জা বস্‌বে না কি শুন্‌তে পাই।"

"কারা করলে বাগান?" সব্জির বাগানের কথাই মনে হয় ভরতের।

"কে জানে? ওখান থেকে লোক এসেছিল কাল গাঁয়ে। বলে, জায়গা জমি দোব—এসে আবাদের কাজে লেগে যাও—"

"কেউ গেছে?"

"দূর! কলকব্জায় কেউ কাজ করতে যাবে না কি? খেতে না পাই গাঁয়ে থেকেই মরব—ও হারাম ছোঁবে কে?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন মনে ভীড় করে আসে ভরতের: "তুই ভালো আছিস ছিদ্দিক? জমিতে ফসল হচ্ছে?"

"আর জমি! জমি নেই—ভরত, এক ফোঁটাও নেই। সব ঢুকেছে রজনী সা-র মহালে—তবে শালার সুদও মারা গেছে ক'বছর! ছেলে দুটো জন খাটে। আমি নৌকো নিয়েছি।"

"রসিক? রসিক কেমন আছে?"

"তুই চলে গেলি তার পর বছরই ত মারা গেল রসিক।"

"মারা গেছে? তারপর?"

"তারপর জমিও নেই তেমন। যা আছে রাইচরণই দেখে। ভাবীকে খাওয়ায়—কুচোকাঁচাগুলো বড় হয়েছে, চাচার সঙ্গে ক্ষেতে যায়। খাওয়া পায় না—চলে যায় কোনোরকম।"

"বোচন"—

"শ্বশুরের দেশে চলে গেছে।"

"ছোট কর্ত্তা ফিরে এসেছে দেশে ?"

"সে ত কবেই। পাগলাটে হয়ে গেছে। বলে, বাড়িতে ইস্কুল বসাবে। আমার মেয়ের দিকের নাতীকে বলছিল ইস্কুল যেতে। যায়নি। পেটে ভাত আছে যে পড়বে ?

ভরত চুপ করে যায়। আরেকটা কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতে পারে না। ছিদ্দিক কি মনে করবে! তাছাড়া এ বয়সে জিনিষটা ভালোও দেখায় না।

ছিদ্দিকই এবার বল্‌তে সুরু করে: "তোর বাড়িতে রজনী সা-র মস্ত গোলাবাড়ি হয়েছে। হ্যাঁরে ভরত, তোর বুনটার খবর রাখিস কিছু ? শুন্‌তে পাই ভৈরব বাজারে ও না কি নেই। তারিণীঠাকুর বলে বেড়ায়। আরো কি কি সব বিতিকিচ্ছে কথা বলে।"

"ও আমার বোন নয় ছিদ্দিক।" ভরতের মুখ কালো হয়ে যায়।

গাঁয়ে পৌঁছেই রায় বাড়িতে গিয়ে ওঠে ভরত। বাইরের উঠোনেই পায়চারি করছিল শঙ্কর। ভরতকে দেখেই হেসে বলে: "খবর কি ভরতমাল ? দেশান্তরী না কি হয়েছিলে ?"

লাজুকের মত হাস্‌তে থাকে ভরত। সদর দালানের সিঁড়িতে বসে শঙ্কর বলে: "তোর খপ্পর থেকে জমি ছিনিয়ে আন্‌লে তারিণী—কিন্তু সে জমি বাঁচল না—রেহান পড়েছে ভরত তোর সেই পাঁচ কাণিও !"

"আপনার জেল হল কত্তা—গাঁয়ে আরো কত কি হয়ে গেল !"

"সব শুনেছি। কত কি হচ্ছে—তা-ও দেখছি। জানিস্ ভরত,"

গাঁ কেউ বাঁচাতে পারবে না। যেদিন জমিদারের টাকা ছিল, মানুষকে কি করে বাঁচাতে হয় জমিদাররা জান্‌তেন না—আজও জানে না—অবিশ্যি আজ জানলেও আর লাভ নেই—কারণ তাদের টাকা নেই। জমিতে সার নেই—খরা হলে জলের ব্যবস্থা নেই, বান এলে জল সরাবার উপায় নেই—উপরে দেবতার দিকে চেয়ে আর কদিন চলে বল! অথচ এই জমির ওপর ঝুঁকে আছি আমরা সব—বছরের পর বছর রাশি রাশি লোক বেড়ে যাচ্ছে গাঁয়ে, আর জমি শুকিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। মনে করিসনে ভরত, একা একজন টাকা ঢেলে গাঁ-কে আবার আগের মত করে তুল্‌তে পারবে—পঞ্চাশটা রাজচন্দ্র সা-র টাকাতেও তা কুলোবে না। যাতে গাঁ বাঁচে তাই করতে গিয়েই জেলে গিয়েছিলাম ভরত কিন্তু জেলই সার হল, গাঁ বাঁচল না!"

হাঁ করে কথাগুলো গিল্‌তে থাকে ভরত। ভাল লাগে শঙ্করের বলার ভঙ্গীটা। আর ভালো লাগে এটুকু বুঝে যে শঙ্কর ভালো কথাই হয়ত বল্‌ছে।

"লোক বেড়ে যাচ্ছে গাঁয়ে। ক্ষেতের ফসলের দিকে সবাই যদি চেয়ে থাকে তবে কেউ বাঁচ্‌বে না—করতে হবে অন্য কাজ। চরকা চালাতে বল্‌ছিনে তোদের। কারখানায় কাজ করতে বলি। চা-বাগান হচ্ছে পাহাড়ে—গাঁয়ের একটি প্রাণীও যাবে না সেখানে। উপোস করে তবু গাঁয়ের মাটিই কামড়ে পড়ে থাক্‌বে। এও ত চায়ের আবাদ—কিন্তু মজুর আনতে হয় বিহারী, সাঁওতালী—কেন তোরা পারিস নে এ কাজ করতে? অনেককে এ-কথা বলেছি, ভরত! তারা বলে বাগানের লোকদের কাছ থেকে আমি টাকা খেয়েছি!"

"আপনি টাকা খাবেন কত্তা?"

"নইলে কেন আমি বলি এদের বাগানে যেতে! ছ'টা মাস গাঁয়ের তিন শ' লোক ঠাঠা উপোস করে—তবু থাকতে হবে গাঁয়ে? কারখানা তৈরী হচ্ছে না দেশে, কোথায় তার জন্মে করব আমরা আফশোষ—না কি কারখানায় কাজ করবার লোক পাওয়া যাবে না! ভরত, দেশটা পরকে দিয়ে আমাদের মরে যাওয়া ভালো!"

"আমি যাব কত্তা বাগানে—" ভরতের চোখে যেন নতুন একটা রং-এর আলো এসে লাগ্‌ল।

"খেয়ে বাঁচতে হলে যেতেই হবে—কিন্তু কেউ তা বোঝে না, সবাই ভাবে চিরকাল ক্ষেত যেমন তাদের খাইয়ে এসেছে—আজও খাওয়াতে পারবে!' ময়লা খদ্দরের কাপড়ের খুটে কপালটা মুছে নেয় শঙ্কর—তারপর দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ বয়সে শিবরাম রায়ও এম্নি অসহায় চোখে চেয়ে থাকতেন।

"ওম্নি সব আজব কথাই বলে ছোট কত্তা—" ছিদ্দিক ভরতকে বোঝায়: "মাথা খারাপ হয়ে গেছে ফাটকে গিয়ে! বাগানে কেউ যায়? সর্ব্বনাশ!—ও পাহাড়ের দিকেই কেউ তাকায় না।"

ভরত সায় দেয় না। অন্য কথা পাড়ে: "এ বেলার মত কিন্তু চাট্টি ভাত খাওয়াতে হবে ছিদ্দিক—"

"আমার এখানে ভাত খাবি?"

"একঘরে হয়ে থাকবার আমার ত ভয় নেই—কাল সকালেই চলে যাচ্ছি।"

"তা খাস্! কিন্তু শুধুই ভাত—বড় জোর এক আধ ছিঁটে শুঁটকী

যদি পাওয়া যায়! চলে না ভরত—পেট চলে না। তুই খেতে চাচ্ছিস্—আবার কবে তোর সঙ্গে দেখা হয় জানিনে, একটা ছালনও তোকে দিতে পারব না।"

"শুঁটকীতেই আমার চল্‌বে—মোচ্ছবের আর দরকার নেই।"

মাছ ধরতে গিয়েছিল আসরফ আর আব্বাস, ছিদ্দিকের তুই ছেলে। বাপজানকে দেখাতে এল তাদের শিকার—কুঁচো চিংড়ি আর বেলে মাছ ক'টা।

"তোর ভাগ্যি আছে ভরত—" ছিদ্দিক বলে: "জ্যান্ত মাছই খেতে পাবি। এই আসরাফ্, তোদের চাচা হয়, ভরত চাচা, সালাম দে—"

ছেলে দুটো ভরতকে সেলাম জানিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ভরত ট্যাঁক থেকে দুটো সিকি বার করে আনে, ছেলে দুটোর দু'হাতে গুঁজে দিয়ে বলে: "নে ব্যাটারা মেঠাই খাস্—গরীব চাচা খাওয়ালো তোদের।" চোখের উপর হাতের পিঠটা চালিয়ে আনে ভরত।

হাতের উপর সিকি দুটো নিয়ে ওরা দাঁড়িয়েই ছিল। ছিদ্দিক বলে: "নিয়ে নে---যা। বড় হয়ে ওরা ত তোকে দেখেনি, ভরত, চিনতে পারবে না।"

খুব ভোরেই জেগে ওঠে ভরত। বাইরে এসে চারদিকে চায়। ঠিক তেম্নি আছে শশীদলের চেহারা। অশথগাছটা ঠিক তেম্নি, আর যেন একটুও বুড়ো হয় নি। তেম্নি ক্ষেত, তেম্নি জল, জলের উপর ধানগাছের মাথাগুলো। ক্ষেতের গায়ে লেখা নেই রজনী সা-র নাম, তারা শুধু আগেকার মতই ক্ষেত। জমিদার বাড়ির চূড়া-ভাঙ্গা মঠটা দেখা যায়—মনে হয় ওখানে

গেলে দেখতে পাবে সে শিবরাম রায়ের সাদা ধবধবে চেহারাটা—শঙ্করের কথা মনেই আসে না যেন। কিন্তু তার নিজের বাড়িতে দেখতে পাবে কি সে গিয়ে সুবর্ণকে? সুবর্ণের কথা মনে আনতে চায় না ভরত, ভাবে—সে কোনোদিন ছিল না, কোথাও ছিল না সে। তার বাড়ি এখন গোলাবাড়ি—ভুরভুরে ধানের গন্ধ সেখানে। ধানের গন্ধ কিন্তু ভালোবাসত সুবর্ণ।

হুঁকোটা মুখে নিয়ে ছিদ্দিকও বেরিয়ে আসে।

"গাঁ-টা একটু ঘুরে আসি ছিদ্দিক—"

"হেঁ—এ বেলাটা ত আছিস্!"

"কেন?"

"দুপুরে নৌকা নিয়ে যাব ষ্টেশনে—সে নৌকোতেই যাস্।"

"ও, আমার মনেই ছিল না—তুইও যে মাঝি হয়েছিস।"

"গাঙ্গ পাড় করে দি', তারপরই শালা বলিস্!" বিড়ালের ভেংচির মত করে ছিদ্দিক হাসে।

বাজারটাও বদ্‌লায় নি। শুধু পীতাম্বর নেই। তাই ভরতের কাছে অনেক কিছু নেই। কুড়িদের বেণেতি দোকান, রজনী সা-র গদী সবই মনে হয় পড়ে গেছে খানিকটা। ভরতের মনের ভুল হবে। কিন্তু চোখে ত সে দেখ্‌তে পাচ্ছে লোকজনের ভীড় নেই। কে কিন্‌বে কাপড়? গাঁয়ে কারো পরণে ছেঁড়া ফালি ছাড়া দেখ্‌ল না ভরত! শকুনের মত উবু হয়ে বসে আছে গদীতে রমেশ কুড়ি। ভরত এগিয়ে গিয়ে বলে: "ভালো আছ কুড়ির পো?"

"ভরত, কবে এলি?"

"কাল। তুমি ভালো আছ ত?"

"কই আর ভালো—ম্যালেরিয়ায় ধরেছে—কুইনিন গিলে গিলে শরীর কি হয়েছে ছাখ্! শুনছি দোকান ভৈরব বাজারে উঠে যাবে—তাহলে বেঁচে যাই, ভরত!"

"দোকান উঠে যাবে কেন? টাকাপয়সা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছ বুঝি?"

"সে ত কবে থেকেই।"

"সোনাদানা গাঁয়ে আর নেই—এখন বড় জায়গা ছাখো!" ভরত নিজেই অবাক হয়ে যায়, থাড়া থাড়া কথা ত সে কোনদিন বল্‌তে পারত না। কিছু বল্‌তে আজ যেন তার জিভে আটকায় না!

রমেশ মুখ ফিরিয়ে নেয়। কতক্ষণ চারদিকে ঘুরে ফিরে বাজার থেকে বেরিয়ে আসে ভরত।

সঙ্গে ছিদ্দিক নেই। টুনীর খোঁজটা নেওয়া যায় এখন। অনেকেই নেই গাঁয়ে—চলে গেছে, মরে গেছে। টুনী কি আছে? মেয়ে মানুষ—কতকাল লড়াই করে থাক্‌বে সবার সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে লড়াই, ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই, লড়াই অসুখের সঙ্গে।

"আরে ভরতদা—?" প্রায় চেঁচিয়ে বেরিয়ে আসে টুনী। সেই টুনী—আগেকার মত গলা তার—তেমনই গায়ের রং—একটু ভেঙে গেছে মুখটা, তবু হাস্‌তে পারে ঠিক আগের মত করে।

"তোদের আবার দেখ্‌তে এলাম, টুনী!"

"তবু ভাগ্যি মনে পড়েছে!"

"ভালো আছিস, টুনী?" সেই সাদাসিধে প্রশ্ন ভরতের।

"ভালো থাকা যায় কি, ভরতদা ? বেঁচে আছি—মরিনি।"

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে শরীর ঠিক ঢাকে না, ঢাকবার চেষ্টাও করে না টুনী। ভারতের সাম্‌নে বলেই নয় সবার সামনেই এ কাপড়ে বেরুতে পারে সে।

"আজই চলে যাচ্ছি আবার—"

"আজই ?" টুনীর ঠোঁটগুলো যেন জড়িয়ে যায়।

"এখানে আর কি আছে আমার বল্‌।"

টুনী অপলকে ভরতের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে : "সত্যি।"

"তারপর ?" দাওয়ায় উঠে বসে ভরত।

"তারপর আর কি ?" ভরতের কথারই যেন জের টানে টুনী।

"কাজকর্ম্ম করছিস্‌ না ?"

'করছি। নইলে ভাত দেবে কে ?"

ভরত কি যেন ভাবতে থাকে। ভাত চেয়েছিল টুনী একদিন ভরতের কাছে। সত্যি, টুনীকে ভাত দেবে কে ? যদি সে নিজে তার যোগার করতে না পারে !

"খাবে ভরতদা, আমার এখানে এ বেলা ? চাল আছে।"

"খাওয়াবি ? খাব।"

"তবু বল্‌লে !" মুখে আঁচল চেপে রাখে টুনী।

ভরত গল্প সুরু করে। বলে, চা বাগানের কথা। কিছুই জানেনা সে চা বাগানের। তবু বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে ফেলে। আর কোনদিন দেখা হবে না এমন কথা টুনী যেন না ভাবে। পাহাড়েই ত চা-বাগান, বছরে এক আধ বার নিশ্চয়ই সে গাঁয়ে আসবে ! লাল ইঁটের

ঘরেই থাকবে হয়ত সে—কিন্তু তাতে কি এসে যায়—দেখাশুনো করতে গাঁয়ে আসবার কথা ভুলবে না সে কিছুতেই।

"এসো।" টুনী বলে। তারপর ঘরে ঢুকে চালের একটা হাঁড়ি বার করে আনে। চাল আছে। দুজনার মতই। টুনীর দু'বেলার চাল। ভরতের জন্যই কি মাপা ছিল চালটা!

"বাজার থেকে একবার ঘুরে আসি টুনী—মাছ উঠেছে দেখলাম।" কোমর থেকে টাকা পয়সার পুটলীটা বার করে আনে ভরত। তিন টাকার মত এখনো আছে। দুটো আস্ত টাকা টুনীর হাতে তুলে দিয়ে বলে: "রাখ তোর কাছে—যাবার সময় নিয়ে যাব।"

তখনই মনে মনে জানে ভরত যাবার সময় ভুলে সে টাকা দু'টো ফেলে যাবে।